ইউনিট-৯
প্রবন্ধ রচনা

পাঠ ৯.১ :

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- প্রবন্ধের সংজ্ঞার্থ, আকৃতি, প্রকৃতি ও রূপ সম্পর্কে বলতে পাবেন।
- প্রবন্ধ রচনার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রবন্ধের উদাহরণ লিখতে পারবেন।
- নিজে নিজে প্রবন্ধ রচনার দক্ষতা অর্জন করবেন।

প্রবন্ধ কী ?

প্রবন্ধ সাহিত্যের এক বিশেষ প্রকরণ। সংস্কৃত শব্দ 'প্রবন্ধ'-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো 'প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন'; বাংলায় শব্দটির একই অর্থ রক্ষিত। গদ্যে রচিত লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত, মননশীল, যুক্তিশাণিত আঁটোসাঁটো বন্ধনে নিয়ন্ত্রিত সাহিত্যরূপই হলো প্রবন্ধ। প্রবন্ধ শব্দটির বিকল্প হিসেবে বাংলায় 'রচনা' শব্দের ব্যবহারও লক্ষণীয়, যার অর্থ 'নির্মাণ করা'। ইংরেজি Essay শব্দের পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এর প্রকৃতি প্রবন্ধের সঙ্গে ঠিক মেলে না।

প্রবন্ধের প্রকারভেদ

প্রবন্ধ সাহিত্য প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত;

(ক) চিন্তাশ্রিত

(খ) ভাবাশ্রিত।

প্রথমোক্ত ধরনে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সর্বাধিক, আর দ্বিতীয়োক্ত ধরনে লেখকের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রাধান্য।

প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশ

রচনার প্রধান অংশ তিনটি;

(ক) ভূমিকা

(খ) মূল বিষয় ও

(গ) উপসংহার।

ভূমিকাংশে বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করা হয়, কোনো তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক বিশ্লেষণ থাকে না। ভূমিকা হতে হয় সব সময় সংক্ষিপ্ত, সংহত ও মনোগ্রাহী। এরপর আসে মূল বিষয়। রচনার এই অংশেই মূলত কাঙ্ক্ষিত বক্তব্যটি যুক্তি, তত্ত্ব, তথ্য, উপাত্তের আলোকে পরিপূর্ণ অবয়বে রূপান্বিত হয়। বিষয়বস্তু সঠিক ও তাৎপর্যপূর্ণরূপে উপস্থাপনের জন্য মূল বিষয়কে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে ভাগ করে নিতে হয়। তথ্য যৌক্তিক পরম্পরায় উপস্থাপিত ও সন্নিবেশিত হতে হবে। মূল বিষয় বিস্তারিত আলোচনার শেষে আসে উপসংহার। এ অংশে থাকে বিষয় সম্পর্কে লেখকের অভিমত ও সিদ্ধান্ত।

প্রবন্ধের ভাষা

প্রবন্ধের ভাষা হবে সহজ, প্রাঞ্জল, গতিশীল ও আড়ষ্টতামুক্ত। অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহারে ভাষাকে অনাবশ্যক জটিল করার প্রবণতা পরিহার করা খুবই জরুরি। সাধু ও চলতি রীতির মিশ্রণ থেকে ভাষা মুক্ত হবে। বাক্য অনাবশ্যক জটিল ও অলঙ্কারবহুল হওয়া উচিত নয়।

উদ্ধৃতি ব্যবহার
উদ্ধৃতি ব্যবহারে রচনার মান বাড়ে; বক্তব্য বিষয় অনেক বেশি সুবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য হয়। তবে উদ্ধৃতির অনাবশ্যক ও ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহার হিতে বিপরীত হয়।

রচনার দৈর্ঘ্য
রচনা হতে হবে সুগঠিত ও পরিপূর্ণ। তবে এর আকার অতি ছোট বা অতি দীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। পরিসর যা-ই হোক, সামগ্রিকভাবে রচনার মান যেন বজায় থাকে এবং বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও সম্পূর্ণতা অর্জিত হয় সেদিকটা নিশ্চিত করা রচনাকারের মূল দায়িত্ব।

নমুনা হিসেবে কতগুলো প্রবন্ধ/রচনা উপস্থাপন করা হলো।

রূপসি বাংলাদেশ

ভূমিকা
প্রকৃতির এক অপরূপ লীলাভূমি বাংলাদেশ। প্রকৃতি তার অকৃপণ উদারতায় তিল তিল করে সাজিয়েছে এই মনোলোভা দেশটিকে। বিস্তীর্ণ সমভূমি, রূপালি নদীনালা, শ্যামল পাহাড়-টিলা, সবুজ বন-বনানী আর তরঙ্গমুখর সাগর বিচিত্ররূপের অপরূপ সমারোহে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে প্রকৃতির রূপসি কন্যা। বাংলাদেশের অনাবিল সৌন্দর্যে আপ্লুত হয়ে কবি আবেগমথিত উচ্চারণে বলেছেন ‘রূপসি বাংলা’।

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য
পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। এর উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। উত্তরের পাহাড় বেয়ে নেমে আসা পলি জমে জমে সাগরের বুক থেকে জেগে উঠেছে এ দেশ। এর গায়ে জড়িয়ে আছে হাজারো নদীর জাল। এর সমতল ভূমি দিগন্ত থেকে দিগন্তে প্রসারিত। শুকনো মৌসুমে সবুজ ফসলের মাঠে ঢেউ তোলে দখিনা বাতাস, আবার বর্ষাকালে সেই মাঠেই দেখা যায় নদী উপচানো পানির তরঙ্গমালা। ফসলের মাঠের দিকে তাকালে মনে হয় সবুজ কাপড় গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ নামের প্রকৃতি-কন্যা। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মাথায় সবুজ টোপর পড়ে ধ্যানমগ্ন ঋষির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে ছোট-বড় অসংখ্য পাহাড়। পাহাড়ের কোল জুড়ে সাজানো রয়েছে চা বাগান। বিচিত্র গাছপালা আর জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ এ পাহাড়ি বনাঞ্চল। পাহাড়ি ঝরনা আর জলপ্রপাত স্বপ্নাবেশ তৈরি করে সৌন্দর্যপ্রেমী মানুষের মনে। উত্তরে রয়েছে গেরুয়া রঙের মাটির ভাওয়াল ও মধুপুরের গড়, যেখানে সৈনিকের মতো দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি গজারি গাছ। পশ্চিমে রয়েছে অবারিত প্রান্তরের ধুলিধূসর রুক্ষতা। তবে সেখানেও আছে মাঠের পর মাঠ আমের বাগান, পানের বরজ আর আখের ক্ষেতের সবুজ গালিচা। দক্ষিণে বাংলাদেশের পা চুমু দিয়ে শুয়ে আছে বঙ্গোপসাগর; আর সাগরের সঙ্গে মিতালি স্থাপন করে উপকূল জুড়ে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন। বন জুড়ে সবুজ পাতার ঘন আস্তরণ এক অপরূপ নৈসর্গিক দৃশ্য সৃষ্টি করেছে। সেখানে বসতি গড়েছে ডোরাকাটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর চিত্রল হরিণেরা। সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা নদীগুলোতে বাস করে ভয়ানক কুমির। সবকিছু মিলিয়ে ভয়াল সুন্দর এ বনভূমি সৌন্দর্যপিপাসু মানুষের চিত্তকে হরণ করে নেয়। নীল সাগরের বুকে জেগে ওঠা দ্বীপসমূহে তাল-নারকেল-সুপারির বাগান, বেত-শোলা-কেওড়ার বন আর প্রান্তর জোড়া ধানক্ষেত– সবুজে-নীলে মাখামাখি এ এক অপরূপ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য।
বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত। এখানে অবারিত জলরাশির শুভ্র-ফেনিল তরঙ্গমালার গর্জন এক অপূর্ব সুরাবেশ তৈরি করে। বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন’স সমুদ্রমোহনায় অপরূপ শোভা নিয়ে অবস্থান করছে। ফয়’স লেকের নৈসর্গিক শোভা মনোলোভা। কুয়াকাটা সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে দেখা যায় সমুদ্রে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের নান্দনিক দৃশ্য।

সবুজ শ্যামলিমা ছায়া সুনিবিড় গ্রামগুলোই বাংলাদেশের প্রাণ। কতিপয় শহর বাদ দিলে বাংলাদেশ তো 'গ্রাম বাংলা'। প্রকৃতির নিটোল সৌন্দর্যে গর্বিত এই বাংলা। দিগন্ত প্রসারিত সবুজের অবগুণ্ঠন ভেদ করে উঁকি দেয় সোনালি শস্য। নদী-বিল-ঝিলের স্বচ্ছ পানিতে দোলে সাদা, লাল কিংবা গোলাপি শাপলা। অলস দুপুরে একটানা বিরহের সুর তোলে ঘুঘু। গরু চরানোর ফাঁকে গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে রাখাল বাঁশিতে তোলে করুণ রাগিণী। গোধূলি বেলায় আকাশে ধূলি উড়িয়ে গরুর পাল লয়ে তারা ঘরে ফেরে। আলো-আঁধারির ঐ সময়ে দল বেঁধে বলাকাদের উড়ে যাওয়া এক অপার্থিব দৃশ্যের সৃষ্টি করে। অন্ধকার নেমে না আসতেই বাঁশবাগানের মাথার ওপর জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা নিয়ে উপস্থিত হয় চাঁদ; বন-বনানীর পাতায় পাতায় লাগে আলোর নাচন। বাংলার এমন সৌন্দর্যে বাঙালির মন হয় মাতোয়ারা; এই সর্ববিস্তারী সৌন্দর্য বাঙালির মনকে করেছে কোমল, শুভবোধে উদ্দীপ্ত।

ঋতুভেদে রূপের বৈচিত্র্য

ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। ঋতুর পালাবদলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রকৃতিতে ঘটে বর্ণময় রূপবদল। প্রতিটি ঋতু আসে আপন স্বাতন্ত্র্যে, অপরূপ রূপসজ্জায়। প্রতিটি ঋতুর রয়েছে নিজস্ব রং ও সৌন্দর্য। বঙ্গঋতুর রঙ্গশালায় প্রথম ঋতু গ্রীষ্ম। দুই চোখে ক্রুদ্ধ বহ্নিজ্বালা নিয়ে তার আবির্ভাব। প্রচণ্ড অগ্নিবাণে এ সময় বাংলার বুক বিদীর্ণ হয়; চৌচির হয়ে যায় এর তৃষ্ণার্ত প্রান্তর। নিদারুণ দহন যন্ত্রণায় কাতর হয় পাখ-পাখালি, জন্তু-জানোয়ার। চারিদিকে তখন কেবল ধূলিময় ধূসরতা। এরই মধ্যে কাল-বোশেখী ধেয়ে আসে সবকিছুকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে। এই রাগী ঋতুও মধুময় হয়ে ওঠে আম, জাম,লিচু, কাঁঠাল, আনারসের রসে।

দহন-কাতর প্রকৃতির করুণ প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে 'শ্যাম-গম্ভীর সরসা' রূপে নবযৌবনা বর্ষা দিগ্বিজয়ী যোদ্ধার ন্যায় মেঘের পিঠে সওয়ার হয়ে বাংলার প্রকৃতির কোলে আসন পাতে। রৌদ্রদগ্ধ তৃষাতুর ধরণী বর্ষার অমৃতরসে অবগাহন করে প্রাণ-প্রাচুর্যে মেতে ওঠে, শ্যাম-স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে রুক্ষ ধরণী। প্রকৃতির বিষণ্ন অঙ্গ থেকে গ্রীষ্মের অবসাদ মুছে দিয়ে সজল বর্ষা প্রকৃতিতে জাগায় নবপ্রাণের শিহরণ। শস্য শিশুরা জেগে ওঠে মাটির বুক ভেদ করে; কদম, জুঁই, হাসনাহেনার সৌরভে মুখরিত হয় বাংলার প্রকৃতি। খেয়ালি বর্ষা বাংলার প্লাবনের ঢল নামায়, অবিশ্রান্ত বর্ষণে মাঠ-ঘাট, নদীনালা কানায় ভরে ওঠে; দূর দিগন্ত থেকে মাথায় মেঘের বোঝা নিয়ে দুরন্ত গতিতে উন্মত্তের মতো ধেয়ে আসে 'বাদল দিনের পাগলা হাওয়া'। প্রবল ক্রোধে যেন দুমড়ে-মুচড়ে দিতে চায় বাড়িঘর, গাছপালা। কখনো গভীর প্রশান্তিতে আকাশ থেকে ঝরে প্রবল মুষলধারা। নদীতে স্রোতের বান ডাকে; মত্ত স্রোত ঘরবাড়ি, গবাদি পশু, ফসল, রাস্তাঘাট সবকিছু ভাসিয়ে নেওয়ার প্রমত্ত খেলায় মেতে ওঠে। আবার কখনো বর্ষার কৃপণতা গ্রীষ্মের চণ্ডতাকেও হার মানাতে চায়। বাংলার ঋতুবলয়ে বর্ষাই প্রধানতম ঋতু; বাংলার শ্যামল প্রকৃতিতে আর কৃষি-নির্ভর অর্থনীতিতে এই ঋতুর সুগভীর প্রভাব। বাংলার প্রধানতম কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গানে-গল্পে কেবলি বর্ষা-প্রকৃতির বন্দনা :

"নীল নব ঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর
আউশের ক্ষেত জলে ভরভর
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনায়েছে দেখ চাহিরে
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।"

প্রকৃতিকে ধুয়ে-মুছে শুচি-স্নিগ্ধ কোমলতা দিয়ে বাংলার শ্যামল অঙ্গনে উপস্থিত হয় শরৎকাল। বর্ষার ঘন মেঘ ধীরে ধীরে হালকা হয়ে আসে, অলস মন্দ্র-মন্থর গতিতে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরে বেড়ায় 'সাদা মেঘের ভেলা'। কোমল রোদের স্নিগ্ধ আভায় ঝলমল করে ওঠে প্রকৃতি। কাশফুলের শুভ্রতা প্রকৃতিতে শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়; শিউলি ফুলের সৌরভে মন যায় উদাস হয়ে। শরতের সকালে কচি ঘাসের ডগায় মুক্তো দানার মতো শিশির ঝলমল করে ওঠে। শারদ শোভায় মোহিত কবি তাই আপন মনে গেয়ে উঠেন–

"আজিকে তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে
হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।"

অমল ধবল শরতের পেছনে পেছনে প্রকৃতিকে সোনার রঙে রাঙিয়ে বাংলার রূপময় মঞ্চে আবির্ভূত হয় হিমের চাদর গায়ে-মোড়ানো হেমন্ত। ধান কাটার ধুম পড়ে যায় মাঠে মাঠে। ধান কাটা শেষ হলে প্রকৃতিতে যেন ছড়িয়ে থাকে বৈরাগ্যের বিষণ্নতা। ইতোমধ্যে অবশ্য মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করে দেয় শীতের সবজির কচি পাতা। ঘরে ঘরে তখন নবান্নের উৎসব। আবহমান বাংলার মানুষের কাছে এটিই সবচেয়ে সুখের সময়।

পিঠার গন্ধ পেয়েই যেন বাংলার প্রকৃতিতে হাজির হয় শীতের হিমবুড়ি। খেজুরের রসে বাঙালির পিঠা-উৎসব পূর্ণতা পায় এ সময়। শীতের কুয়াশায় ঢেকে যায় সকালের সূর্য। শীতের তীব্রতায় মানুষ জবুথবু হয়ে যায়, কাপড়ের ওপর কাপড় জড়িয়ে মানুষ শীত নিবারণের চেষ্টা চালায়। দরিদ্র মানুষেরা কাপড়ের অভাবে কষ্ট পায়। শীতের প্রকোপে গাছে গাছে চলে পাতা ঝরার পালা। গাছগুলো যেন নিজেদের মৃত ঘোষণা করে দেয়। তবে শীতকালে সবজির বিপুল সমারোহ ঘটে। গাঁদা, গোলাপ– এমনি সব বাহারি ফুলে নিষ্প্রাণ প্রকৃতিও রঙিন হয়ে ওঠে।

শীতের তীব্রতা কমতেই আড়মোড়া দিয়ে জেগে ওঠে প্রকৃতি, মৃতবৎ গাছগুলোর নিষ্পত্র শাখাগুলো রাতারাতি পত্রপুষ্পে মঞ্জুরিত হয়ে ওঠে। ঋতুমঞ্চে আগমন ঘটে মহারাজ বসন্তের। দখিনা মৃদুমন্দ বাতাসের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে ফুষ্পের সৌরভ, অলিকুলের গুঞ্জরণে আর উদাস দুপুরে কোকিলের কুহুতানে মন মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। বসন্ত-প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ কবি তাই গেয়ে ওঠেন–

“ওগো দখিনা মলয়, আজি তব পরশনে,
কার কথা পড়ে মনে।
মধুপ হয়েছে আজি পাগল পারা
কুসুমে কুসুমে তাই জেগেছে সাড়া।”

উপসংহার

রূপের বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ বাংলাদেশ যেন কোনো এক রূপদক্ষ শিল্পীর আঁকা এক অসাধারণ শিল্প-প্রতিমা; শিল্পীর তুলির আঁচড়ে শিল্পীর মনোভূমির নির্যাস থেকে যেন গড়ে উঠেছে এই রূপময় বাংলাদেশ। তাই মুগ্ধ কবি বাংলার গর্বিত পরিচয় তুলে ধরেন এভাবে–

“এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।”

স্বদেশপ্রেম

ভূমিকা

মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ মানুষের সহজাত প্রবণতা। স্বদেশের ধুলিকণা গায়ে মেখে, স্বদেশের শস্য-দানায় শরীরের পুষ্টিসাধন করে, স্বদেশের প্রকৃতির শ্যামল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েই মানুষের জীবন। মায়ের কোলে মতোই দেশ মানুষের কাছে এক পরম নির্ভরতার স্থল, এক বরাভয় আশ্রয়। দেশ তাই মানুষেরর চেতনার অংশ; দেশের সঙ্গে মানুষের সমগ্র সত্তার সংযোগ। মানুষের চেতনায় নিরন্তর বয়ে যায় দেশপ্রেমের অনিঃশেষ ফল্গুধারা; দেশকে ভালবেসে মানুষ নিজেকে ধন্য করে, নিজেকে পূর্ণ করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় দেশের প্রতি বাঙালির অনুরাগ:

“সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মা গো তোমায় ভালবেসে।”

স্বদেশপ্রেম কী

নিজের দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি, মাতৃভাষার প্রতি, দেশের প্রকৃতির প্রতি বিমুগ্ধ ভালবাসা আর গভীর শ্রদ্ধাবোধই হলো স্বদেশপ্রেম। স্বদেশপ্রেম উৎসারিত হয় মানুষের আত্মার নিবিড় চৈতন্যবোধ থেকে। দেশের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা আর গৌরবের অনুভূতি তার অভিভূত মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। দেশপ্রেমীর মনে স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি এত প্রগাঢ় হয় যে, স্বদেশের কোনো অবমাননা অথবা স্বদেশবাসীর দুঃখ-দৈন্য নিরসনে নিতান্ত হেলায় নিজের জীবন, ধন, মান সর্বস্ব উৎসর্গ

করে দিতে পারে। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত মানুষদের নিবেদিতপ্রাণ কর্মযজ্ঞেই গড়ে ওঠে একটি দেশের সমৃদ্ধির সৌধ; বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠে দেশটির গৌরবময় অবস্থান।

দেশপ্রেমের উৎসবীজ

বিশ্বময় বিরাজমান প্রতিটি প্রাণিরই নিজের জন্মস্থান ও পরিবেশের প্রতি রয়েছে অন্তর্নিহিত টান। বনের পশুকে লোকালয়ে আনলে সে তার স্বাভাবিক জীবন হারায়, মর্মান্তিক যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে থাকে। নীড়ের প্রতি আসক্তি পাখির চিরায়ত। প্রাচুর্যময় ইমারতের চেয়ে খড়কুটোর দরিদ্র আবাসই তার কাছে শ্রেয়। পাখিকে নীড়চ্যুত করলে সে আর্তনাদ করে ওঠে। কোনো সুরক্ষিত আশ্রয়ের মোহে কখনোই বিবর ত্যাগ করে না মুষিক। তার মানে জন্মস্থানই সবার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, জন্মস্থানেই সবাই নিজেকে নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ অনুভব করে। অনুরূপভাবে, দেশ মানুষের কাছে এক সুবিশাল বাসগৃহস্বরূপ। নিজ আবাসের প্রতি নাড়ীর টানেই মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে দেশের প্রতি ভালবাসা।

দেশপ্রেমের স্বরূপ

স্বদেশের উপাদান দিয়েই তৈরি হয় মানবদেহের অণু-পরমাণু– অস্থি-মজ্জা, রক্ত-মাংস। দেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক জৈব-মানসিক। এ কারণেই দেশের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতায় সে অনুভব করে অঙ্গহানির যন্ত্রণা। স্বীয় দেশ দরিদ্র হলেও দেশপ্রেমী মানুষের কাছে দেশের মর্যাদা রাজরাণীর। দেশের প্রতি সুগভীর অনুরাগ ও আনুগত্যের কারণেই স্বদেশের সুখের দিনে মানুষ আনন্দে পরিপ্লাবিত হয়, দেশের যে কোনো গৌরবে নিজে হয় গৌরবান্বিত; আবার দেশের কোনো দুর্যোগে সে গভীর বেদনা অনুভব করে, স্বদেশের স্বাধীনতা ও মান-মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মত্যাগেও দ্বিধা করে না। স্বদেশপ্রেম দেশের মানুষকে নিজের সবকিছু উজাড় করে দিতে উদ্বুদ্ধ করে।

দেশপ্রেমিকের গুণাবলি

একজন দেশপ্রেমিক সবসময় স্বদেশের মঙ্গল-চিন্তায় থাকে বিভোর, স্বদেশের মঙ্গল-সাধনে নিবেদিত। তার কাছে স্বার্থপরতা ও আত্মসুখ নিতান্তই তুচ্ছ। একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক দেশের প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় দুঃখকে বরণ করে, হাসিমুখে পান করে মৃত্যুর হলাহল। পরাধীন দেশকে স্বাধীন করতে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করে দেশপ্রেমী জনতা, শত্রু নিধনের যজ্ঞে হাসতে হাসতে প্রাণ দেয় অকুতোভয় দেশপ্রেমিক। দেশের জন্য যারা জীবন-পণ লড়াই করে তারা যেমন দেশপ্রেমিক; তারাও দেশপ্রেমিক, যারা স্বদেশের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধনে নীরবে নিভৃতে কাজ করে যায়। কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, সমাজকর্মী, চিকিৎসক, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, শ্রমজীবী মানুষ তাদের মেধা ও মননের চর্চায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে তিলে তিলে গড়ে তোলে দেশের সমৃদ্ধির সোপান, বিশ্ব-সভায় নিশ্চিত করে দেশের জন্য গৌরবের আসন। এভাবেই দেশের প্রতি তাদের গভীর ভালবাসার অভিপ্রকাশ ঘটে।

স্বদেশপ্রেমের উদাহরণ

স্বদেশের স্বাধীনতা, গৌরব ও মর্যাদা রক্ষার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য মানুষ দেশপ্রেমের প্রেরণায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোকের আত্মদান মানবেতিহাসে দেশপ্রেমের এক অনন্য নজির। দেশপ্রেমের কঠিন ব্রতে উত্তীর্ণ হয়েই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়েছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি হয়ে উঠেছেন স্বদেশ ও মাতৃভাষাকে ভালবেসেই। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, জগদীশ চন্দ্র বসু, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, তীতুমীর, মাস্টার্দা সূর্যসেন– এমনি আরো বহু দেশপ্রেমিকের কীর্তিতে উজ্জ্বল হয়েছে বাংলা মায়ের শ্যামল মুখ। উপমহাদেশে দেশপ্রেমের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, এ.পি.জে. আব্দুল কালাম প্রমুখ মনীষীগণ। ইতালির গ্যারিবল্ডি, চীনের সান ইয়াতসেন, মাওসেতুং, আয়ারল্যান্ডের ভেলোরা, তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কন, মার্টিন লুথার কিং, রাশিয়ার লেনিন, ফিলিস্তিনের ইয়াসির আরাফাত, দক্ষিণ আমেরিকার নেলসন ম্যান্ডেলা প্রমুখ ব্যক্তির অতুলনীয় দেশপ্রেম পৃথিবীর ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে।

জাতীয় জীবনে দেশপ্রেমের গুরুত্ব

জন্মভূমি জননীর মতো। মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়ে মায়ের শরীর থেকে রস নিয়ে যেমন একজন শিশু বেড়ে ওঠে, মায়ের অস্তিত্ব ছাড়া যেমন সন্তানের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তেমনি দেশহীন মানুষের অস্তিত্বও কল্পনা করা অসম্ভব। জন্মভূমির আলো, বাতাস, খাদ্য, পানীয় সেবন করেই মানুষ বেঁচে থাকে, বড় হয়ে ওঠে। তাই দেশের সঙ্গে মানুষ আত্মিক বন্ধনে বাঁধা। সন্তানের ভালবাসায় মায়ের মুখের হাসি যেমন মুক্তো দানার মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি দেশপ্রেমী মানুষের অপার ভালবাসায়, ত্যাগে, কর্মে দেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়। দেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাঁচে না, দেশ বাঁচে মানুষের ভালবাসায়। জন্মভূমির প্রতি মানুষের ঋণ অনুভব করতে হয়, ঋণের দায় থেকেই মানুষ দেশের প্রতি দায়িত্বশীল হয়, এ ঋণই দেশের উন্নয়নে ও সেবায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। দেশের মানুষ তাদের কর্মতৎপরতায় দেশকে যতটুকু সমৃদ্ধ করে, দেশ ততটুকুই এগোয়। মনে রাখতে হবে, দেশ সম্মানিত হলে এর মানুষও সমানভাবে সম্মানিত হয়। বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের উচিত দেশপ্রেমের যে চেতনায় ১৯৭১-এ আমরা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে শত্রুমুক্ত করেছি, সেই একই চেতনায় শাণিত হয়ে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন, নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ পরিহার করা। দেশের প্রতি গভীর আবেগ নিয়ে আমরা যদি দেশের বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে সুস্থ গণতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চা করি, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চায় নিবেদিত হই, দুর্নীতি পরিত্যাগ করে নিজ নিজ কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করি, সন্ত্রাস-হত্যা-রাহাজানি বন্ধ করে দেশের উৎপাদন বাড়াতে আত্মনিয়োগ করি, বিদেশি পণ্যের প্রতি মোহ ত্যাগ করে দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়াই, দেশের প্রতি আনুগত্য বাড়িয়ে নাগরিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন পারি, তবেই দেশের প্রতি আমাদের ভালবাসা পূর্ণতা পাবে। অন্যথায় দেশের প্রতি আমাদের ভালবাসা ফাঁকা আওয়াজে পরিণত হবে মাত্র।

প্রবাসে দেশপ্রেমের উপলব্ধি

প্রবাসে মানুষ দেশের সঙ্গসুধা থেকে বঞ্চিত হয়। স্বজনবিহীন বিচ্ছিন্ন পরিবেশে স্বদেশের প্রতি মানুষের আবেগ যথার্থ পরিসর লাভ করে। প্রবাসে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে জন্মভূমির যথার্থ মূল্য। যেমনটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন প্রথম জীবনে জন্মভূমি-বৈরী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সুদূর ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে বসে অনুতপ্ত কবি এক অপার আবেগে জন্মভূমির বন্দনায় মেতে উঠেন :

> "বহু দেশ দেখিয়াছি বহু নদ-দলে
> কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
> দুগ্ধ স্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে।"

প্রবাসে স্বদেশ হাতছানি দিয়ে ডাকে। দীর্ঘ প্রবাস জীবন শেষে দেশের স্নেহময় সংস্পর্শে এলে মানুষের তৃষ্ণা-কাতর প্রাণের ওপর দিয়ে যেন গভীর শান্তিদায়ী অমৃতরসের ফোয়ারা বয়ে যায়।

স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের পারস্পরিক সম্পর্ক

সঙ্কীর্ণ স্বার্থচিন্তার উর্ধ্বে মানবতাবাদে নিহিত রয়েছে দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের মূল। স্বদেশপ্রেমের ভ্রূণেই জন্ম নেয় বিশ্বপ্রেম। দেশ ও দেশের মানুষকে ভালো বাসতে বাসতেই একজন স্বদেশপ্রেমী মানুষ বিশ্বকে ভালবাসতে শেখে। দেশের প্রতি উৎসারিত ভালবাসা একসময় বিশ্বপ্রবাহে ধাবিত হয়; তখন একজন দেশপ্রেমী তার দেশের মধ্যেই পেয়ে যায় বিশ্বের মহাবার্তা। বাংলার কবি দেশকে ভালবেসেই হয়ে যান বিশ্বকবি, বাংলার কায়ায় দেখেন বিশ্বে ছায়া :

> "ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা
> তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

উগ্র দেশপ্রেম

দেশপ্রেম কখনো কখনো উদার প্রশস্ত রাস্তা ছেড়ে সঙ্কীর্ণতার পথে হাঁটে; তখনি জন্ম নেয় অতি-দেশপ্রেম, যার রূপ প্রমত্ত, পরিণতি ভয়ঙ্কর। উগ্র দেশপ্রেমের বিনাশী পরিচয় বিশ্ব পেয়েছে দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। জার্মানির হিটলার আর ইতালির মুসোলিনীর উগ্র দেশপ্রেমের বলি হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। দেশপ্রেম সবসময়ই শুভ, কল্যাণকর; কিন্তু উগ্র দেশপ্রেম কট্টর জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়, যা চিরকালই অকল্যাণের ও অশান্তির।

মানুষের ওপর স্বদেশপ্রেমের প্রভাব

স্বদেশপ্রেমের শেকড় মানুষের মনুষ্যত্বে। দেশপ্রেম মানুষের মন থেকে মুছে দেয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি, মানুষের মনে বয়ে আনে মহত্ত্ব। স্বদেশপ্রেমীর তপস্যা ত্যাগের; দেশ ও জাতির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মন্ত্রে তার মন উজ্জীবিত। স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিকদের ত্যাগের প্রভায় গৌরবোজ্জ্বল হয়েছে মানবেতিহাস। অনাদিকালের মানুষ ঐ মহাপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছে আত্মত্যাগের দীক্ষা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার অবিনাশী প্রেরণা।

উপসংহার

দেশপ্রেম পবিত্র ও কল্যাণকর। দেশপ্রেমীদের ত্যাগে আর দায়িত্ববোধেই একটি দেশ উন্নতির শিখরে আরোহণে সক্ষম হয়। দেশপ্রেমিকের ভাবনা জুড়ে থাকে দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণ। প্রতিটি মানুষেরই উচিত দেশকে ভালবাসা ও তার কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, দেশের প্রতি ভালবাসার আতিশয্যে অন্য কোনো দেশ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, মানবতা যেন কোনোভাবেই লজ্জিত না হয়। এটি নিশ্চিত হলেই দেশপ্রেম সর্বাংশে কল্যাণদায়ী হবে।

বাংলা নববর্ষ

সূচনা

সময়ের নিয়মে 'পুরাতন বছরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি'র অন্তিম প্রহরে দীপ্ত সূর্যোদয় ঘোষণা করে আরেকটি নতুন বছরের আগমনী বার্তা, যে বার্তা বহন করে অপার সম্ভাবনা, অনেক স্বপ্ন, অফুরন্ত আনন্দ। নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে মানুষ পেরিয়ে যেতে চায় তার পুরনো হতাশা, ব্যর্থতা আর অপ্রাপ্তির বেদনাকে; প্রাপ্তির আনন্দে জীবনকে পূর্ণ করার স্বপ্ন বুনে নতুন করে। সাফল্যের দোরগোড়ায় নিজেকে পৌছানোর উদ্যম নিয়ে শুরু করে নতুন পথচলা। উৎসবে উৎসবে মানুষ বরণ করে নেয় এই মাহেন্দ্রক্ষণটিকে। দেশে দেশে নতুন বছরের এই আড়ম্বরময় বরণ হয়ে উঠেছে ঐতিহ্য।

দেশে দেশে নববর্ষ

সময়ের ফ্রেমে বন্দি মানুষেরা সময়ের হিসাব মেনেই তার স্বপ্ন বুনে, জীবন সাজায়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবম্বিধ বহু প্রয়োজনে মানুষ সময়কে দিন, সপ্তাহ, মাস, বছরে বিভাজন করে। আর এর জন্য মানুষ নির্ভর করে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধির ওপর। এই নির্ভরতা কখনো সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ, আবার কখনো পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের প্রদক্ষিণের সময়সীমার ওপর। সৌর বা চান্দ্র যা-ই হোক মানুষ এই সময়ের বৃত্তে নিজের কর্মপরিকল্পনা সাজায় এবং তা বাস্তবায়নে প্রবৃত্ত হয়। কখনো স্বপ্ন পূরণের আনন্দে হয় আত্মহারা; আবার কখনো মূহ্যমান হয় স্বপ্নভঙ্গের বেদনায়। তবে মানুষ কখনো চূড়ান্তভাবে পরাভূত হয় না; নতুন বছরের আগমনে অতীতের সকল গ্লানি মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে শিরদারা সোজা করে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। নতুন বছর মানুষের মনে সৃষ্টি করে নতুন উদ্দীপনা। তাই দেশে দেশে নববর্ষ হয়ে ওঠেছে উৎসবের উপলক্ষ। তবে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। বছরের প্রারম্ভিক সময়টি কোথাও নির্ধারিত হয়েছে ধর্মীয় কোন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে, আবার কোথাও সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক বিবেচনায়। মুসলমান ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায় নববর্ষ উদ্‌যাপন করে নিজ নিজ ধর্মের ধর্মপ্রবর্তকের ঐতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্যের আলোকে। আবার জাতি হিসেবে বাঙালি, চিনা, জাপানি, ইরানি– এ সকল জাতি পালন করে নিজ নিজ নববর্ষ উৎসব। যে কোন নামে, যে কোন সময়েই উদ্‌যাপন করা হোক না কেন, নববর্ষ অনুষ্ঠানের অভিন্ন চারিত্র্য হলো এর শুভবোধ, সর্বজনীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা।

বাঙালির জীবনে নববর্ষ

এক সর্বজনীন কল্যাণ চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে বাঙালি মেতে ওঠে নববর্ষের বর্ণাঢ্য আয়োজনে। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের সকল সীমারেখা মুছে দিয়ে বাঙালি এক অভিন্ন আত্মায় মিলিত হয়, নির্মল আনন্দে চিত্তকে করে পরিপ্লাবিত। এ দিনে চিত্তের দীনতা, বিত্তের উনতা, জীবনের হতাশা আর রিক্ততাকে পেছনে ফেলে প্রতিটি বাঙালি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়। প্রাণের উচ্ছ্বাসে সাজায় ঘরদোর, বর্ণিল পোশাকে সাজায় নিজেকে; অকৃত্রিম সহৃদয়তায় পরস্পরকে বাঁধে আলিঙ্গনে, শুভেচ্ছায় সিক্ত করে পরস্পরকে।

নববর্ষের উৎসবাদি

বাঙালি জীবনে উৎসবের বান ডেকে আসে নববর্ষ; বিচিত্র উৎসবে মুখর হয়ে ওঠে এদেশের প্রতিটি শহর- বন্দর- গ্রামের আনাচ-কানাচ। নির্মল আনন্দ দানের পাশাপাশি উৎসবগুলোর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বও অপরিসীম। বছরের হিসাব-নিকাশ, চাষাবাদ, খাজনা আদায়, বিয়ের তারিখ ঠিক করা – এসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাঙালি গ্রহণ করে বাংলা বর্ষপঞ্জি মেনে; আর তা করে উৎসবের আমেজে। নববর্ষের উৎসবগুলোর মধ্যে পুণ্যাহ, হালখাতা, বৈশাখি মেলা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ক) পুণ্যাহ : পুণ্যাহ শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো পুণ্য কাজের জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রানুমোদিত প্রশস্ত দিন। কিন্তু বাংলায় এর অর্থ দাঁড়িয়েছে নতুন বছরে প্রজাদের কাছ থেকে জমিদারদের খাজনা আদায়ের শুরুর দিন। এ দিনে প্রজারা ভাল পোশাক পরে জমিদারদের কাছারি বাড়িতে খাজনা দিতে যেতেন; আর জমিদারগণ মিষ্টান্ন ও পানসুপারি দিয়ে প্রজাদের আপ্যায়ন করতেন ও তাদের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন। এভাবে জমিদার-প্রজার মধ্যে পারস্পরিক সহজ ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হতো। জমিদারি প্রথা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুণ্যাহ অনুষ্ঠানেরও বিলোপ ঘটেছে।

(খ) হালখাতা : হালখাতা নববর্ষের এক বিশেষ ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান। বছরের প্রথম দিনটিতে ব্যবসায়ীরা তাদের প্রতিষ্ঠানে ক্রেতা ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের আমন্ত্রণ জানায় এবং মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়ন করে। ক্রেতারা তাদের বকেয়া পরিশোধ করে পুরনো বছরের লেনদেন সম্পন্ন করে এবং নতুনভাবে লেনদেন শুরু করে। এভাবে ব্যবসায়ী ও খদ্দেরের মধ্যে গড়ে ওঠে এক মধুর সম্পর্ক।

(গ) বৈশাখি মেলা : বৈশাখি মেলা এ দেশের এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। এ মেলায় দেশীয় কুটির শিল্পজাত পণ্যের সমারোহ ঘটে। এখানে দেশীয় খাদ্য আর শিশুদের মন-ভোলানো পণ্য ক্রয়ের ধুম পড়ে যায়। গার্হস্থ্য জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও গ্রামের মানুষেরা মেলা থেকে সংগ্রহ করে। ছেলে, যুবা, বুড়ো, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের আনন্দ-কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে মেলার প্রাঙ্গন। শহরেও মেলা এসেছে বর্ণাঢ্য রূপ নিয়ে। মেলাগুলোতে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয় হয়। এ মেলার মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বই মেলা শহরে নববর্ষ উদ্‌যাপনের নতুন অনুষঙ্গ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নেচে গেয়ে শহরের মানুষেরা নববর্ষকে বরণ করে নেয়। উৎসবকে প্রাণবন্ত করতে অতিথিপরায়ণ বাঙালি এ দিনে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানায়। মুখরোচক খাবার আর গল্পে-আড্ডায় উৎসবমুখর পরিবেশে তারা কাটিয়ে দেয় দিনটি।

নববর্ষ উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচি

বাংলাদেশ সরকার নববর্ষকে সর্বজনীন উৎসব হিসেবে বিবেচনা করে এবং দিবসটিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালন করে। দিবসটিকে উৎসবের রঙে রাঙানোর জন্য সরকারি কর্মচারীদেরকে নববর্ষ ভাতা প্রদান করছে। বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, নজরুল ইনস্টিটিউট, ছায়ানট, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি– এসব প্রতিষ্ঠান এবং দেশের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে থাকে। রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান এক বিশেষ ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের বকুলতলার প্রভাতি অনুষ্ঠান ও মঙ্গল শোভাযাত্রা বাংলা নববর্ষ বরণে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে।

বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর নববর্ষ বরণ

বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী বর্ণাঢ্য আয়োজনে চৈত্র সংক্রান্তি ও বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করে। এটি পাহাড়িদের সবচেয়ে বড় উৎসব। এ উৎসবকে চাকমারা ‘বিজু’, মারমারা ‘সাংগ্রাই’, ত্রিপুরারা ‘বৈসুক’ ইত্যাদি নামে আখ্যা দিলেও গোটা পাহাড়ি অঞ্চলে এটি ‘ বৈসাবি’ নামে অভিহিত।

বাঙালি জীবনে নববর্ষের তাৎপর্য

বাংলাদেশে বহু জাতি-গোষ্ঠীর লোকের বসবাস। প্রতিটি সম্প্রদায়ের রয়েছে নিজ নিজ ধর্ম ও তার উৎসব। তবে নিজ নিজ ধর্মীয় পরিচয় ছাপিয়ে এ দেশের মানুষের সর্বজনীন পরিচয় বাঙালি হিসেবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষই পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। পহেলা বৈশাখ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাঙালির সর্বজনীন উৎসব। এ উৎসবের মাধ্যমেই এ

দেশের সকল মানুষ সকল ভেদাভেদ ভুলে এক অখণ্ড বাঙালি চেতনায় উজ্জীবিত হয়। ফলে জাতিগত ঐক্য ও সংহতি দৃঢ় হয়; আমাদের জাতীয় চেতনা হয় মজবুত।

উপসংহার

নববর্ষ বাঙালির জীবনে পরম আনন্দের উৎসব। এই উৎসব কেবল আমাদের আনন্দ জোগায় না; আমাদের মধ্যে সমৃদ্ধ আগামির স্বপ্ন ও প্রেরণা জাগায়। নববর্ষ সকল বাঙালির মনে জাতীয় চেতনার বীজ বোনে। নববর্ষের শুভক্ষণে বাঙালি জাতি এক অসাম্প্রদায়িক চেতনার সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার শপথে বলীয়ান হয়। চির অম্লান হোক বাংলা নববর্ষ, নতুনের চেতনা নিয়ে বরাভয় হাতে বাঙালির জীবনে বার বার ফিরে আসুক বাংলা নববর্ষ - এই হোক আমাদের প্রার্থনা।

মানব কল্যাণে বিজ্ঞান /আধুনিক জীবন ও বিজ্ঞান

ভূমিকা

বিজ্ঞানের বেদীমূলে প্রোথিত মানবসভ্যতার শেকড়। যেদিন মানুষ আগুন আবিষ্কার ও তার ব্যবহারে দেখিয়েছে পারঙ্গমতা সেদিন থেকে শুরু হয়েছে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। মানুষ তার জীবনকে সহজ করার জন্য হাতের বদলে হাতিয়ার ব্যবহারে সফল হয়েছে বিজ্ঞানের দৌলতে। এরপর বহু যুগ-যুগান্তরের অজস্র মানুষের স্বপ্ন ও সাধনার সরণি বেয়ে বিজ্ঞান আজ সর্বজয়ী রূপে আবির্ভূত। মানবসভ্যতা আজ বিজ্ঞানময়। বিজ্ঞানের আশীর্বাদ ছাড়া বর্তমান দুনিয়ার একটি মুহূর্তও কল্পনা করা যায় না। বিজ্ঞানের কল্যাণস্পর্শে জীবনের সর্বক্ষেত্র হয়েছে সহজ ও আনন্দমুখর; মানবসভ্যতা হয়েছে সমৃদ্ধ।

বিজ্ঞানহীন যুগ

বিজ্ঞানহীন যুগে ছিল গুহাবাসী; পশুর সঙ্গে ছিল না কোনো প্রভেদ। প্রকৃতি ও পরিবেশ ছিল মানুষের জন্য চরম বৈরী। ভয়ানক অসহায় মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়েছে চরম বৈরী শক্তির সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করে। জান্তব শক্তির সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইয়ে কখনো বিজয়ী হয়েছে মানুষ, শত্রুর কাচা-মাংসে করেছে উদরপূর্তি, আবার কখনো নিজেই হয়েছে হিংস্র প্রাণীর খাবার। বৈরীশক্তির প্রতিনিয়ত লড়াই থেকে মানুষ অর্জন করেছে অভিজ্ঞতা, কালক্রমে সেই অভিজ্ঞতা পরিণত হয়েছে জ্ঞানে; আর জ্ঞান বিশেষায়িত হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে বিজ্ঞানে। কোনোমতে বেঁচে থাকার আদিম লড়াইয়ে মানুষের কাছে সুখের পরশ ছিল সুদূর পরাহত। বিজ্ঞান মানুষের অসহায়ত্বে জুগিয়েছে দুর্বার শক্তি, সুখহীন জীবনে বইয়ে দিয়েছে সুখের ফোয়ারা।

সমাজ ও জীবনে বিজ্ঞানের দান

মানবজীবনে বিজ্ঞানের দান অপার ও বিস্ময়কর। আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বিজ্ঞানের নানা উপকরণের সঙ্গে লগ্ন। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের অনিবার্য প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবনে ও সমাজে; ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে মানুষের চিন্তাধারা ও জীবনায়ন। গৃহে বা বাইরে, কর্মস্থলে বা বিনোদন কেন্দ্রে, পথে বা মাঠে সর্বত্র বিজ্ঞান আমাদের ছায়াসঙ্গী। বিজ্ঞানের পরিচর্যায় আমাদের জীবন হয়েছে সহজ, অনায়াস ও সুন্দর। বৈদ্যুতিক বাতিতে আমাদের ঘর যে আলোময় আর বৈদ্যুতিক পাখার ঘূর্ণনে ঘর যে শীতল হয়ে ওঠে তাতে বিজ্ঞানের দান শতভাগ। এভাবে বিজ্ঞানের কল্যাণে বেতার ও টিভি যোগে জেনে নিতে পারি দেশ-বিদেশের হালচালের খবর; টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে অতি সহজে সেরে নিতে পারি দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা কর্ম-সম্পর্কিত মানুষের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষার কাজটি। কম্পিউটারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কম্পোজ হচ্ছে অনায়াসে; আর তা সংরক্ষিত হচ্ছে অত্যন্ত নির্ভরতার সঙ্গে। প্রয়োজনমতো এ সকল তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে আদান-প্রদান করাও সম্ভব হচ্ছে অতি সহজে। জল, স্থল ও আকাশপথে অনায়াসে ও দ্রুততার সঙ্গে চলাচল ও মালামাল পরিবহন সম্ভব হচ্ছে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সব আবিষ্কারের কারণে। বিজ্ঞান আমাদের নিস্তরঙ্গ ও স্থবির জীবনে এনেছে গতি; বিজ্ঞানের সহযোগে আমাদের জীবনে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য।

প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞান

প্রভাতের শয্যা ত্যাগ হতে নিশীথের শয্যা গ্রহণ পর্যন্ত আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বিজ্ঞানের সুরে বাঁধা। বেঁধে দেওয়া সময়ে এলার্ম ঘড়ির ছন্দময় ঝংকারে যথারীতি আমাদের ঘুম ভাঙে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে আমরা যে টয়লেটটিতে

প্রবেশ করি তা বিজ্ঞানের পরিচর্যায় সাজানো-গোছানো পরিপাটি। বিজ্ঞানের বদৌলতে প্রয়োজন অনুসারে ঠাণ্ডা বা গরম পানির প্রবাহ আমাদের সামনে এসে হাজির হয়। দাঁত মাজার ব্রাশ আর পেস্ট বিজ্ঞানেরই দান। গ্যাসের চুলায় বা ইলেকট্রিক হিটারে তৈরি হয় গরম চা; ফ্রিজে সংরক্ষিত নাস্তা ওভেনের কল্যাণে অতি সহজেই খাবার উপযোগী হয়ে ওঠে। বাজারে প্রতিদিন দৌঁড়াতে হয় না; ফ্রিজেই সংরক্ষণ করা যায় গৃহের প্রয়োজনীয় খাদ্য সম্ভার। বিজ্ঞানের দৌলতে ছাপাখানা থেকে হাজারো সংবাদ গায়ে মেখে প্রতিদিন দরজার নিচ দিয়ে ঢুকে সংবাদপত্র। ইস্ত্রি করা পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি জামায় সেজে কর্মস্থলের দিকে যাত্রা করতেই দরজার সামনে লিফট উপস্থিত। লিফট থেকে নামতেই ব্যক্তিগত মোটর গাড়ি দরজা খুলে দাঁড়িয়ে। যাদের ব্যক্তিগত গাড়ি নেই, তাদের জন্য আছে বাস, ট্যাক্সি, ট্রেন, রিকসা ইত্যাদি বাহন। পথ শেষে ঝলমলে আলোয় স্বাগত জানায় কর্মক্ষেত্র; সেটিও আবার বিজ্ঞানের বিচিত্র উপচারে সাজানো। টাইপরাইটার ও কম্পিউটারে টাইপ হয় প্রয়োজনীয় ফাইল ও চিঠিপত্র এবং কম্পিউটারের সাহায্যে রক্ষিত হয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব। কর্মব্যস্ত অফিস শেষে ছুটির পর বিনোদনের জন্য রয়েছে সিনেমা, ভিসিআর, স্যাটেলাইট টিভি ইত্যাদি। ক্লান্ত দেহটি এলিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে আরামের বিছানা। ঘুমকে নির্বিঘ্ন করার জন্য আছে শীততাপ যন্ত্র, নিদেনপক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা। এভাবে বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের জীবনের গাঁটছড়া বাঁধা।

শুধু শহুরে জীবন নয়, গ্রামীণ জীবনও বিজ্ঞানের ছন্দে বাঁধা। নাগরিক জীবনের সুযোগ-সুবিধাগুলো গ্রামের দিকেও প্রসারিত। বৈদ্যুতিক বাতিতে গ্রামের ঘরগুলো উজ্জ্বল, মোবাইল ফোন সকলের হাতে হাতে, স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলো আজ গ্রামের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে গ্রামীণ মানুষের হাতের মুঠোয় আজ পৃথিবীর তথ্যবিশ্ব। মান্ধাতার আমলের কৃষিব্যবস্থায় এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কৃষক জমিচাষে গরুর হালের বদলে ব্যবহার করছে ট্রাক্টর, আবহাওয়া নির্ভরতা কমিয়ে উন্নত সেচব্যবস্থার আশ্রয় নিচ্ছে, উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার করছে, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করছে। এসবই সম্ভব হচ্ছে বিজ্ঞানের আশীর্বাদে। বিজ্ঞানের বদৌলতে শহর-গ্রামের ব্যবধান ও দূরত্ব তুলনামূলকভাবে কমে গেছে।

বিচিত্র ক্ষেত্রে বিজ্ঞান

জগৎ ও জীবনের এমন কোনো অঙ্গন নেই যেখানে বিজ্ঞানের প্রবেশ ঘটেনি। খনির অন্ধকারে বিজ্ঞান আলো ফেলেছে, আকাশে উড়িয়েছে তার বিজয় নিশান, মহাশূন্যে পাঠিয়েছে পৃথিবীর দূত। বিজ্ঞানের কল্যাণে দূরের নক্ষত্রলোকের খবর পেয়েছে গ্রহলোকের মানুষ। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষ উদ্দাম নদী স্রোতকে বশীভূত করে নিয়ে গেছে ঊষর মরু-প্রান্তরে, মরুর পাথুরে বুকে জাগিয়েছে প্রাণের স্পন্দন। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে বাষ্পীয় শক্তি মানুষের বশীভূত, পারমাণবিক শক্তি মুঠোয় বন্দী, আকাশের বিদ্যুৎ বাতির ভেতরে প্রশান্ত। বিজ্ঞানের বদৌলতে স্থল পথে ছুটছে ট্রেন, মোটর; গভীর সমুদ্রে ঢেউয়ের বুক ভাঙে জাহাজ; আকাশ তোলপাড় করে উড়ে চলে শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী বিমান; অসীম মহাশূন্যে পাড়ি দেয় ছোট কোনো নভোযান। কারখানায় তৈরি হচ্ছে জীবনের জন্য প্রয়োজনের আর উপভোগের বিচিত্র সামগ্রী, বসবাসের জন্য তৈরি হচ্ছে হরেক রকমের দালান। ঘরের ভেতরে রান্না করার চুলা, মশলা গুঁড়ো করার গ্রাইন্ডার, মাছ-মাংস-সবজি কাটা ও প্রক্রিয়াকরণের বিচিত্র উপকরণ, রাইস কুকার, খাবার সংরক্ষণের ফ্রিজ, খাবার গরম করার ওভেন, কাপড় ধোয়ার মেশিন, ঘর শীতলীকরণের এসি– জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যদানকারী সকল সামগ্রীই আমাদের জন্য বিজ্ঞানের উপহার। বিজ্ঞানের যাদুস্পর্শে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এসেছে বিপ্লব। কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, বসন্তের মতো যেসব রোগ মহামারীরূপে জনপদের পর জনপদ নিশ্চিহ্ন করে দিত সেসব এখন মামুলি রোগে পরিণত হচ্ছে। টীকা আবিষ্কারের মাধ্যমে মারাত্মক সব রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে; অনেক রোগের মৃত্যুঘণ্টা ঘোষণা করেছে বিজ্ঞান। নানা ধরনের সূক্ষ্ম ও জটিল অপারেশন হচ্ছে অহরহ। বাইপাস সার্জারি আর হৃৎপিণ্ড পরিবর্তন এখন আর যাদু নয়। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে নির্ভুলভাবে রোগ নির্ণয় আর অস্ত্রোপচারের কাজ অনায়াসে সাধিত হচ্ছে। মরণঘাতী ক্যান্সারের উন্নত চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়েছে, এইডস নিরাময়ের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা। কৃষি ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম। উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবন, কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। কোনো প্রকার হাতের স্পর্শ ছাড়াই যান্ত্রিক কলাকৌশল ব্যবহার করে জমি তৈরি থেকে শুরু করে ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পর্যন্ত সকল কাজ অনায়াসে সাধিত হচ্ছে। বিজ্ঞান যোগাযোগ ব্যবস্থায় এনেছে বিপ্লব। জল-স্থল-আকাশ পথের দ্রুতগতির বাহনের পাশাপাশি টেলিফোন, টেলিগ্রাম, ফ্যাক্স, টেলিপ্রিন্টার ইত্যাদি তৈরি করে বিশ্বকে পুরেছে হাতের মুঠোয়। কম্পিউটার আর ইন্টারনেটের বদৌলতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত আজ কম্পিউটারের সঙ্গে হাতের আঙুলের

স্পর্শের দূরত্বে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে শিক্ষার্থীর শিক্ষাঙ্গন আজ বিশ্বময় বিস্তৃত। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই শিক্ষক লেকচার দিতে পারেন, শিক্ষার্থী যে কোনো বই অতি সহজেই সংগ্রহ করে নিতে পারে ইন্টারনেটের সহযোগিতায়, গোগল সার্চ দিলেই শিক্ষার্থীর সামনে উন্মোচিত হয় জ্ঞানের অপার দিগন্ত। পরীক্ষা-কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীকে হাজির হতে হয় না, ঘরে বসেই অংশগ্রহণ করতে পারে পৃথিবীর যে কোনো দেশের পরীক্ষায়। প্রযুক্তির ব্যবহারে অফিসের কর্ম-পরিবেশ হয়েছে উন্নত, কাজে এসেছে গতি এবং নিপুণতা। ব্যবসা-বাণিজ্যও আজ প্রযুক্তি-নির্ভর, সকল প্রকার হিসাব-নিকাশ ও লেন-দেনের কাজ কম্পিউটার আর অনলাইনেই সম্পন্ন হচ্ছে। সারাদিনের কর্ম-ক্লান্ত দেহ ও মনের জন্য বিনোদন প্রয়োজন– তারও ব্যবস্থা করে রেখেছে বিজ্ঞান। সিনেমা, টেলিভিশন হাতের নাগালেই। ডিশ-এন্টেনার সহযোগে হাতের রিমোটেই ঘুরে তামাম দুনিয়ার বিনোদন জগৎ। এসবই হলো বিজ্ঞানের ম্যাজিক।

বিজ্ঞানের অভিশপ্ত দিক

বিজ্ঞানের অপরিসীম কল্যাণকর দিকের বিপরীতেই লুকিয়ে আছে এর ভয়ংকর অন্ধকার দিক। বিজ্ঞানের বদৌলতে পৃথিবীর ভাণ্ডারে জমা হয়েছে মারাত্মকসব মারণাস্ত্র। শুধু একটি পারমাণবিক বোমার আঘাতে মুহূর্তেই লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে হাজার বছরে গড়ে ওঠা একটি সমৃদ্ধ জনপদ, নির্বিচারে নিহত হতে পারে হাজার হাজার মানুষ। ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা, নাগাসাকিতে বিজ্ঞানের মানববিধ্বংসী তাণ্ডব বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্য বিশেষত ফিলিস্তিন, ইরাক, সিরিয়ায় যে মানবতা-বিরোধী তাণ্ডব চলছে তা বিজ্ঞানের কদর্যতম দিকটিকেই আমাদের সামনে উন্মোচন করে। তবে মনে রাখতে হবে, এর দায় বিজ্ঞানের নয়, কিছু সংখ্যক মানুষের সীমাহীন লোভই এর জন্য দায়ী। মানুষের মধ্যে শুভবোধের উদয় হলেই বিজ্ঞান হবে মানুষের জন্য অপরিসীম কল্যাণের দূত।

উপসংহার

বিজ্ঞানের অভিযান আজ সর্বত্র; জল-স্থল-অন্তরীক্ষ জয়ে এর সীমাহীন উদ্দীপনা। পৃথিবীর বুকে মানুষের রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিজ্ঞানের বদৌলতে, বিজ্ঞানের হাত ধরেই মানুষ জয় করতে চায় দুর্জয়কে। মনে রাখতে বিজ্ঞান স্বয়ংক্রিয় কিছু নয়, পুরোটাই মানুষের মস্তিষ্কের ব্যাপার; বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা গূঢ়-রহস্য উদ্ঘাটনের মানবিক প্রয়াস। বিজ্ঞানের বিশ্বে নিজেকে বিজ্ঞান-মনস্ক হতে হবে, বিজ্ঞানের প্রতি ও বিজ্ঞানের ব্যবহারে সদর্থক হতে হবে। তবেই বিজ্ঞান হবে পরিপূর্ণরূপে মানুষের।

অনুসারী রচনা : দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান/ বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব/ডিজিটাল বাংলাদেশ

ভূমিকা

বাংলাদেশের মানুষের মুখে মুখে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দবন্ধ সম্ভবত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার রূপরেখা ও সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন রয়েছে এ শব্দবন্ধে। আধুনিক যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ; সমৃদ্ধির শিখরে অধিষ্ঠিত দেশগুলোর সাফল্যের মৌলভিত্তি হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে এদের ব্যাপক সাফল্য। একুশ শতকের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থায় উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবাত্মক বিকাশ ঘটানোর বিকল্প নেই। জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প গ্রহণ করে বাংলাদেশ সরকার সময়ের সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ডিজিটালাইজ্‌ড, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য এদেশের মানুষকে হতে হবে অনেক বেশি প্রত্যয়ী, পাড়ি দিতে হবে শ্রমসাধ্য দীর্ঘ পথ। গন্তব্য কষ্টসাধ্য হলেও দুর্গম নয়।

তথ্যপ্রযুক্তি কী

তথ্য শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো যথার্থ বা সঠিক সংবাদ। সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সমগ্র মানুষের বিচিত্র চিন্তা, পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, আবিষ্কারের মাধ্যমে মানব সভ্যতা বর্তমান উৎকর্ষতা পেয়েছে। যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের পটভূমিতে বর্তমান মানবসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, সেই জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতিটি উপাদানই হলো এক একটি তথ্য। 'জ্ঞানই শক্তি' ভিক্টোরিয় যুগের এই শ্লোগান বদলে গিয়ে একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতায় শ্লোগান দাঁড়িয়েছে 'তথ্যই শক্তি'। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বা যে

জাতি তথ্যশক্তিতে যত বেশি সমৃদ্ধ, সে ব্যক্তি বা সে জাতি তত বেশি উন্নত ও সমৃদ্ধ। আর তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির সমন্বিত ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনাই হলো তথ্যপ্রযুক্তি। তথ্যপ্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কম্পিউটিং, মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স, টেলি কমিউনিকেশন, ডাটাবেস উন্নয়ন, বিনোদন, তথ্যভাণ্ডার, নেটওয়ার্ক, সফ্টওয়্যার উন্নয়ন, মুদ্রণ ও রিপ্রোগ্রাফিক, ডিশ এন্টেনা ইত্যাদি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দুই ভাগে বিভক্ত– এক. তথ্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি, দুই. যোগাযোগ প্রযুক্তি। তথ্য সংরক্ষণ প্রযুক্তির মাধ্যমে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ করে ব্যবহার উপযোগী করা হয় আর যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সে তথ্য বিনিময় করা হয়।

তথ্যের অবাধ প্রবাহের মাধ্যমেই বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়া সম্ভব। বিশ্বের যে কোন নতুন একটি আবিষ্কার, নতুন একটি চিন্তা, নতুন কোন তথ্য তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে। তথ্যপ্রযুক্তি মুছে দিয়েছে দেশকালের সীমারেখা। তথ্যপ্রযুক্তির বদৌলতে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন উদ্ভাবনের আমরা সমান অংশীদার। আন্তর্জালের মাধ্যমে আমরা ঘরে বসেই সম্পন্ন করতে পারি গবেষণা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম; মুহূর্তেই লেনদেন করা সম্ভব হচ্ছে যে কোন ধরনের তথ্য। অফিসের কাজকর্ম করার জন্য আজ অফিসে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় সমুদ্রতীরে অবকাশ যাপনকালেও অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে নেওয়া যায় অনায়াসে।

আমাদের জীবনে তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন উৎস তথ্য থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে আমরা আমাদের জীবনধারায় পরিবর্তন আনি, সঠিকভাবে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করি, নিত্য-নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করি, জীবন ও সভ্যতাকে উৎকর্ষমণ্ডিত করি। তথ্যের অবাধপ্রবাহ মানুষের কর্মযজ্ঞকে অধিকতর সহজ করে দিয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপরেখা

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হলেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত বাংলাদেশ সমৃদ্ধি অর্জনে তৎপর। এদেশের দারিদ্র্যের বৃত্ত ভেঙে অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জনের স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারকে এড়িয়ে বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না। বাংলাদেশের সকল কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন ও দ্রুত উন্নতির জন্য সর্বক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এই উপলব্ধি থেকেই ২০২০ সালের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশকে আধুনিক কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেমের আওতায় নিয়ে আসার এক মহাপরিকল্পনা হাতে নেয় বর্তমান সরকার। পরিকল্পনা অনুসারে দেশটির সার্বিক কর্মকাণ্ড যেমন- সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমা, ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, যোগাযোগসহ প্রতিটি সেক্টর পরিচালিত হবে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার দিয়ে। সরকার সর্বাংশে প্রযুক্তি-নির্ভর ভবিষতের সৃমদ্ধ বাংলাদেশের নাম দিয়েছেন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সকল কর্মকাণ্ড প্রযুক্তির ব্যবহারে পরিচালিত হলেই 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর স্বপ্ন পূর্ণতা পাবে।

ডিজিটালাইজেশনে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশকে ডিজিটালাইজ্‌ড রাষ্ট্রে পরিণত করতে তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশে সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পদক্ষেপসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. সরকার প্রায় পুরো বাংলাদেশকে ডিজিটাল টেলিফোন ও ইন্টারনেটের আওতায় এনেছে।

২. তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য ঢাকার কাওরান বাজারে অত্যাধুনিক সুবিধা সম্বলিত একটি 'আইসিটি ইনকিউবেটর' স্থাপন করেছে। এছাড়া তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নে গাজীপুরের কালিয়াকৈরেও 'হাইটেক পার্ক' প্রতিষ্ঠা করেছে।

৩. ডিজিটাল অর্থনীতিতে পুঁজির চেয়েও বেশি প্রয়োজন সৃজনশীলতা। সৃজনশীল মেধা না থাকলে উদ্যোক্তা হওয়া কঠিন। প্রযুক্তি-দক্ষ সৃজনশীল জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার 'কম্পিউটার ল্যাবরেটরি' গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীদের জন্য 'আইসিটি ইন্টার্নশীপ' কোর্স চালু করেছে।

৪. বাংলাদেশে উৎপাদিত তথ্য-প্রযুক্তি ও সফ্টওয়্যার পণ্য বিদেশে বাজারজাতকরণের জন্য 'আইসিটি বিজনেস প্রমোশন সেন্টার' স্থাপন করেছে।

৫. কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তি পণ্যকে করমুক্ত করা হয়েছে। এসব পণ্য ক্রয়ের জন্য সহজ শর্তে ঋণদানের ব্যবস্থা করেছে।

৬. দেশের ৪ হাজার ৫৪৭টি ইউনিয়ন পরিষদে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। স্কাইপি, পল্লি বিদ্যুতের বিল, জমির পর্চা– এসব সেবা এ সেন্টার থেকে পাওয়া যায়।

দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে তরুণ প্রজন্মকে নবীন উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে সরকার। আর উদ্যোক্তা তৈরির জন্য তথ্যপ্রযুক্তি হলো সম্ভাবনাময় খাতগুলোর একটি। সরকারের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি রপ্তানির পরিমাণ ৫০০ কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়া; এবং এ খাতে বিপুল উদ্যোক্তা তৈরি করার লক্ষ্যে সরকার ২০১৮ সালের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের জন্য তিন ধরনের প্রণোদনা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এ জন্য '১০-১০-১০' পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বছরে ১০ মিলিয়ন ডলারের বেশি রপ্তানি করতে পারে এমন ১০টি প্রতিষ্ঠান; অন্তত ১ মিলিয়ন ডলার রপ্তানি করতে পারে এমন আরও ১০টি প্রতিষ্ঠান এবং স্টার্টআপ বা নবীন সৃজনশীল ১০টি প্রতিষ্ঠানকে কাঙ্ক্ষিত সক্ষমতা অর্জনের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। সরকারের এ সকল মেগা প্রজেক্ট ইতোমধ্যে ফলও দিতে শুরু করেছে। বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি-নির্ভর যে কয়টি নতুন উদ্যোগকে সম্ভাবনাময় হিসেবে দেখা হচ্ছে সেগুলোর একটি বাংলাদেশিদের উদ্যোগ ব্যাকপ্যাক। এ প্রতিষ্ঠানটি বাহকের মাধ্যমে এক দেশ থেকে মালামাল হস্তান্তরের সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে।

দেশের কর্মকাণ্ডে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার

বাংলাদেশের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে লেগেছে তথ্য-প্রযুক্তির ছোঁয়া, দ্রুত গতিতেই এগিয়ে চলেছে ডিজিটালাইজেশন। দেশের সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান– ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, ট্রেজারি অফিস পরিপূর্ণরূপে প্রযুক্তিতায়িত। মন্ত্রণালয়সহ সকল অফিসের কার্যক্রম এখন তথ্য-প্রযুক্তির আওতাধীন। প্রযুক্তির কল্যাণে দাপ্তরিক কাজের গতি ও মান অনেক বেড়েছে। কোনো কাজের জন্য এখন আর সশরীরে অফিসে হাজির হতে হয় না। ইন্টারনেটের সহযোগিতায় অফিসের কোনো তথ্য মুহূর্তেই বিনিময় করা যাচ্ছে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হয়ে যাচ্ছে অফিসের কোনো গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় অফিসের কাজ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হতো, ঘুষ-দুর্নীতির অবৈধ লেন-দেন বন্ধ হতো, সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতো। বাংলাদেশ সেই সম্ভাবনার পথেই আছে।

তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষকের লেকচার ভিডিও করে প্রজেক্টরের মাধ্যমে সাদা পর্দায় প্রদর্শন করে সম্পন্ন করা যাচ্ছে জরুরি ক্লাস। কম্পিউটারের সঙ্গে ইন্টারনেটের সংযোগে ঘরে বসে শিক্ষাগ্রহণ এখন খুবই সুলভ। বাংলাদেশে এখন দূর-শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ দুর্লভ বই ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে নেওয়া যাচ্ছে অনায়াসে। তথ্য-প্রযুক্তির বদৌলতে বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

তথ্য-প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহারে বাংলাদেশের চিকিৎসা-ব্যবস্থা আমূল বদলে গেছে। জটিল রোগ নির্ণয় ও অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হচ্ছে বাংলাদেশে। যে কোনো রোগের উন্নত চিকিৎসা এখন বাংলাদেশেই সুলভ। ডাক্তারের সামনে সশরীরে হাজির না হয়েও প্রত্যন্ত গ্রামের কোনো রোগী কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেমের মাধ্যমে শহরের নামীদামী ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে পারছে।

তথ্য-প্রযুক্তির বদৌলতে আমাদের দেশের মান্ধাতার আমলের কৃষিতে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল বীজ ও উন্নত পরিবেশ-বান্ধব সার উৎপাদনে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের কৃষি-বিজ্ঞানীরা সহজেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কৃষি-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছেন, কৃষির সর্ব-সাম্প্রতিক বিভিন্ন আবিষ্কার সম্পর্কে ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানতে পারছেন। কৃষকরাও অতি সহজে উন্নত বীজ ও সারের ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে ধারণা পাচ্ছেন; এমনকি উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্পর্কেও তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও পয়েন্টে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করে জননিরাপত্তার বিষয়ে তদারকি চালু হয়েছে। এতে অপরাধপ্রবণতা কমবে, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশের কারণে বাংলাদেশে এখন অন-লাইনে কেনাবেচা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এতে মানুষ ঘরে বসেই দ্রব্য পছন্দ করছে এবং দ্রব্যের মূল্যও পরিশোধ করতে পারছে। তথ্য-প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহারে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থায় বিপ্লব আসবে সন্দেহ নেই।

দেশে দ্রুত যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে উঠেছে ইন্টারনেট। উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও এখন কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার শতভাগ সম্ভব হলে বাংলাদেশের সবচেয়ে বিশৃঙ্খল এই বিভাগে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা যাবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের দারিদ্র্যের কারণ সম্পদের অপ্রতুলতা নয়; দারিদ্র্যের মূলে রয়েছে পদ্ধতিগত ত্রুটি এবং জনগণের অশিক্ষা ও অসচেতনতা। তথ্য-প্রযুক্তির সঙ্গে এ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা গেলে এবং তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন সেক্টরে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা গেলে বাংলাদেশের সামনে অপেক্ষা করছে এক সোনালি ভবিষ্যৎ। তাই 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' অতিপ্রাকৃত কল্পনা নয়, ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি।

সবার জন্য বিদ্যুৎ

ভূমিকা

বিজ্ঞানের যে আবিষ্কারটি গোটা মানব সভ্যতাকে আমূল পাল্টে দিয়েছে, সেটি নিঃসন্দেহে বিদ্যুৎ। যন্ত্রশিল্পের প্রাণশক্তির অবিকল্প উৎস হলো বিদ্যুৎ। আর কে না জানে যে, যন্ত্রশিল্পে যে দেশ যত বেশি সমৃদ্ধ, উন্নতির মানদণ্ডে সে দেশ তত বেশি অগ্রসর। অনিবার্য সত্য এই, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতির প্রধান শর্তই হলো বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় স্বনির্ভরতা অর্জন। রূপকল্প অনুসারে, ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশকে অবশ্যই বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

জ্বালানি হিসেবে বিদ্যুৎ

কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রাণশক্তি ও মুখ্য উপকরণ হলো জ্বালানি। যন্ত্রশিল্পে জ্বালানি হিসেবে পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি ব্যবহৃত হলেও উন্নততর ও সহজে ব্যবহার্য জ্বালানি হিসেবে বিদ্যুতের কোন তুলনা নেই। অবশ্য বিদ্যুৎ পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ইত্যাদির মতো প্রাথমিক জ্বালানি নয়; উপর্যুক্ত জ্বালানিসমূহকে যন্ত্রশিল্পে ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত দ্বিতীয় স্তরের জ্বালানি হলো বিদ্যুৎ । তবে এর ব্যবহার সহজ ও বহুমাত্রিক – বিদ্যুৎ শক্তিকে খুব সহজেই আলোকশক্তি, তাপশক্তি, শব্দশক্তি, চৌম্বকশক্তি প্রভৃতিতে রূপান্তর করা সম্ভব। যন্ত্রশিল্পের সক্রিয়তা তো শক্তির এই রূপান্তরেই। বিদ্যুতের ব্যবহারে তাই সুইচ টিপলেই আলো জ্বলে; ইস্ত্রি, বৈদ্যুতিক চুলা ইত্যাদি যন্ত্রে তাপ উৎপাদন হয়; ফ্রিজ, রেফ্রিজারেটরে তাপ শোষণে দ্রব্য ও স্থান শীতল হয়; টেলিফোন, টেলিভিশন ইত্যাদি যন্ত্রে চৌম্বক শক্তিতে রূপান্তরণের মাধ্যমে শব্দময় ও দৃশ্যময় হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশে বিদ্যুতের ব্যবহার – অতীত পরিপ্রেক্ষিত

নিকট অতীত পর্যন্ত বাংলাদেশ ছিল নিতান্তই কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৯০ শতাংশের পেশা ছিল কৃষি। কৃষিকাজ ছিল মান্ধাতার আমলের– লাঙল আর প্রকৃতির খেয়াল নির্ভর। উন্নত প্রযুক্তির কোন ছোঁয়া ছিল না, সেচ ব্যবস্থা ছিল না, ছিল না কোন উন্নত বীজের ধারণা। দেশে যতটুকু শিল্প ছিল, সেটি আবার কুটিরশিল্প। কার্যত যন্ত্রশিল্প ছিল অনুপস্থিত। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকলে পড়ে আমাদের কৃষিব্যবস্থায় এক চরম স্থবিরতা নেমে আসে, শিল্পের বিকাশ-সম্ভাবনা হয় তিরোহিত। এমন প্রেক্ষাপটে বিদ্যুতের ব্যবহার ও চাহিদা ছিল মূলত শহরের মানুষের বাতি জ্বালানো ও পাখা চালানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

বাংলাদেশে বিদ্যুতের ব্যবহার– স্বাধীনতা-উত্তর পরিপ্রেক্ষিত

পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল খুবই অপর্যাপ্ত। তাই স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ব্যাপক ঘাটতির সমস্যায় পড়ে। চাহিদা অনুসারে বিদ্যুৎ সরবরাহে অপারগতার কারণে বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়, স্বাধীনতার সুফল হতে জনগণ বঞ্চিত হয়। পঁচাত্তরের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পরবর্তী গণবিমুখ সরকারসমূহ উন্নয়নের প্রাণশক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি উদাসীন থাকায় সমস্যা আরো ঘনীভূত হয়। এছাড়া গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের স্বল্পমূল্য ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ না হওয়ায় বিদ্যুৎ সমস্যা তীব্রতর হয়।

যে বিপুল স্বপ্ন আর সম্ভাবনা নিয়ে সংগ্রামী মানুষেরা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা করেছিল, তা ব্যর্থ হতে পারে না। শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে এদেশের মানুষ নিজেদের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ রচনায় আত্মনিয়োগ করে। মুক্তিযুদ্ধে

নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ার পর জনগণের জীবনমান উন্নত আর সমৃদ্ধ দেশ গঠনের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে । বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের আর ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত করার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একটি উন্নত কৃষিব্যবস্থা ও ভারি যন্ত্রশিল্পের বিকাশের প্রতি সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে। কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে বিদ্যুতের ব্যবহার ও চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে।
বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে গত দুই দশকে বাংলাদেশ দ্রুত বর্ধিষ্ণু জ্বালানি ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং নিকট ভবিষ্যতে এই প্রবণতা আরো তীব্রতর হবে। দ্রুত বিকশিত অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে এক বিশেষ চমক। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এই গতিকে ধরে রাখতে জ্বালানি সরবরাহ দ্রুত বৃদ্ধি করার কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশে জ্বালানি হিসেবে মুখ্যত বিদ্যুৎ শক্তিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই সরকার বিদ্যুৎকে অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করে এর ব্যাপকভিত্তিক সংস্কারের প্রয়োজনে ‘পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান-২০১০’ প্রণয়ন করে। ২০০৯ সালে যখন এ মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে কাজ চলছিল তখন দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য ও ভঙ্গুর পর্যায়ে ছিল। এই অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, সরবরাহ, যথাযথ ব্যবহার ও অপচয় রোধের কার্যক্রমসহ এক ব্যাপকভিত্তিক জ্বালানি উন্নয়ন কৌশলপত্র গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য সহজলভ্য ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৭৮ শতাংশ মানুষ বিদ্যুতের আওতায় আছে, যা ২০০০ সালে ছিল ৩২ শতাংশ।

পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান-২০১০-এ গৃহীত পদক্ষেপ

বিদ্যুৎব্যবস্থার বিপর্যয়কর অবস্থায় সরকার ‘পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান-২০১০’ প্রণয়ন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের একটি রোডম্যাপ গ্রহণ করে। দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার একটি সমীক্ষা করে পি.এস.এম.পি। সমীক্ষায় দেখা যায়, ২০০৬-০৭ সালে যেখানে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ৩,৯৭০ মেগাওয়াট, ২০১১ সালে চাহিদা দাঁড়ায় ৪,৮৩৩ মেগাওয়াট। সমীক্ষায় ২০১৫, ২০২০ ও ২০৩০ সালে বিদ্যুতের চাহিদা নিরূপিত হয় যথাক্রমে ১০,২৮৩ মে.ও, ১৭,৩০৪ মে.ও. এবং ৩৩,৭০৮ মে.ওয়াটে। বিদ্যমান সংকট ও ভবিষ্যতের বিপুল চাহিদা পূরণের জন্য সরকার চার স্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করে :

১ম ধাপ : তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা (৬-১২মাস)
তরল জ্বালানিভিত্তিক রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল পিকিং প্ল্যান্ট নির্মাণ।
২য় ধাপ : স্বল্প মেয়াদী ব্যবস্থা (১৮-২৪মাস)
তরল জ্বালানিভিত্তিক পিকিং প্ল্যান্ট নির্মাণ।
৩য় ধাপ : মধ্য মেয়াদী ব্যবস্থা (৩-৫ বছর)
ক) গ্যাস ও জ্বালানিভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল প্ল্যান্ট নির্মাণ।
খ) গ্যাস ও জ্বালানিভিত্তিক পিকিং প্ল্যান্ট নির্মাণ।
গ) কয়লাভিত্তিক স্টেম প্ল্যান্ট নির্মাণ।
৪র্থ ধাপ : দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা (৫ বছরোর্ধ্ব)
ক) এল.এন.জিভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল প্ল্যান্ট নির্মাণ।
খ) দেশিয়/ আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ।
গ) গ্যাস/ তেলভিত্তিক পিকিং প্ল্যান্ট নির্মাণ।
ঘ) নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ।
ঙ) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ।
চ) আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যের আওতায় বিদ্যুৎ আমদানি।

এ ব্যাপক কর্মযজ্ঞ সফল করার জন্য সরকার নিজস্ব বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগের পথ উন্মুক্ত করেছে।

বর্তমান বিদ্যুৎ পরিস্থিতি

সরকারের তাৎক্ষণিক ও স্বল্প মেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। প্রধানত তেলভিত্তিক স্বল্পমেয়াদি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। ইতোমধ্যে স্থাপিত উৎপাদনক্ষমতা প্রায় ১৫ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। তবে ৯০০০ মেগাওয়াট উৎপাদন করা যাচ্ছে। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে উৎপাদনক্ষমতার সঙ্গে প্রকৃত উৎপাদনের বিরাট ব্যবধান থেকে যাচ্ছে। নাজুক বিতরণ ব্যবস্থার কারণে গ্রাহকের জন্য কার্যত ৬ হাজার ৬৫০ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সরবরাহকৃত বিদ্যুতের সঙ্গে আরো ২ হাজার মেগাওয়াট বেশি বিদ্যুৎ সংযুক্ত করা সম্ভব হলে আপাতত সন্তোষজনক একটা বিদ্যুৎব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

সরকারের রূপকল্প অনুসারে ২০২১ সালে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর মহৎ উদ্যোগের জন্য দেশবাসী চেয়ে আছে। এর জন্য ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে উৎপাদনক্ষম করার পাশাপাশি আরও ৯ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের অবকাঠামো নির্মাণ ও বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্য ও করণীয় নির্ধারণে পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান-২০১৬ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। এ মাস্টারপ্ল্যানে অনুমান করা হয়েছে ২০৪১ সালে বিদ্যুতের চাহিদা হবে ৫২ হাজার মেগাওয়াট; এর বিপরীতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৭ হাজার মেগাওয়াট।

বিদ্যুৎ উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুসারে ২৩ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বয়স ২০ বছরের বেশি। এ সব উৎপাদন কেন্দ্রে যান্ত্রিক ক্রটির কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায়শই ব্যাহত হয়। এছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো জ্বালানি সংকট। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন অতিমাত্রায় প্রাকৃতিক গ্যাস নির্ভর। কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও মজুদ চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত। দেশীয় গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা পেট্রোবাংলা গ্যাস সরবরাহ কমে যাওয়া ছাড়া বাড়ানোর কোন তথ্য দিচ্ছে না; বরং বিদ্যমান গ্যাস দ্রুত নিঃশেষ হওয়ার সংকেত দিচ্ছে। এছাড়া অনুন্নত বিতরণ ব্যবস্থার পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় রয়েছে অব্যবস্থাপনা, অদক্ষতা ও সীমাহীন দুর্নীতি। সিস্টেম লসের নামে ১৫ শতাংশের বেশি বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিড থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ উন্নয়নে সরকারের চলমান পদক্ষেপসমূহ

বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য সহজলভ্য ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ নিশ্চিতকরণের যে প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করেছে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে গতি সঞ্চালক হিসেবে বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে যে দশটি প্রকল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার তিনটিই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং একটি এল.এন.জি টার্মিনাল যা প্রতিষ্ঠিত হবে বিদ্যুতের জন্য জ্বালানি সরবরাহকে নিরবচ্ছিন্ন করার জন্য। বিদ্যুৎ কেন্দ্র তিনটি হল মৈত্রী সুপার বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎকেন্দ্র ও রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্র। তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি, মজুদ ও সরবরাহের জন্য গভীর সমুদ্রে এল.এন.জি টার্মিনাল নির্মাণের এই উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। মাতারবাড়ি-মহেশখালীতে 'এনার্জি হাব' করার কাজ শুরু হয়েছে যেখানে ১০,০০০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষম বিদ্যুৎকেন্দ্র ও কয়লাবন্দর গড়ে উঠবে।

এছাড়া সরকার ২০২১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে ৩হাজার ১৭৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে কাজ করছে সরকারের 'টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্তৃপক্ষ' (স্রেডা)। নবায়নযোগ্য জ্বালানির মধ্যে সৌরবিদ্যুৎই হবে প্রধান। সরকার দুই প্রক্রিয়ায় সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের ব্যবস্থা করেছে–এক. বাড়িভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প, দুই. মিনি গ্রিড প্রকল্প। দেশের বিভিন্ন স্থানে এ পর্যন্ত ১১টি মিনি গ্রিড প্রকল্প স্থাপিত হয়েছে যাদের সর্বমোট উৎপাদন প্রায় দেড় মেগাওয়াট। সৌরবিদ্যুতের মেগা গ্রিড প্রকল্প চালুও প্রক্রিয়াধীন। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০৩০ সালের মধ্যে শুধু তুষ জ্বালিয়ে ১ হাজার ১৪৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। এছাড়া গৃহস্থালি বর্জ্য, হাঁস,মুরগি,গবাদি পশুর মল, মানুষের পয়োবর্জ্য প্রভৃতিও বিপুল পরিমাণ বিদ্যুতের নির্ভরযোগ্য জ্বালানি উৎস হতে পারে। সরকার সকল সম্ভাব্যতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইতোমধ্যে সরকার ৬টি

উপজেলায় সবার জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করেছে এবং অচিরেই বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে উন্নতি করেছে তা টেকসই ও স্থিতিশীল করার জন্য সরকার আধুনিক বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা (স্মার্ট পাওয়ার সিস্টেম) প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দিয়েছে। উন্নত সঞ্চালন ও বিতরণব্যবস্থার পাশাপাশি আধুনিক প্রি-পেইড মিটার ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির (লাইট, ফ্যান, এসি, ফ্রিজ ইত্যাদি) বিদ্যুৎসাশ্রয়ী ব্যবস্থা গড়ে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

রূপকল্প বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

১। বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন যোগানের জন্য গ্যাসের উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়ানো, অভ্যন্তরীণ কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি, কয়লা আমদানির জন্য দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি ও গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ, এল.এন.জি আমদানি এবং নিরাপদ পরমাণু প্রযুক্তি নিশ্চিতকরণ।

২। বিপুল পরিমাণ অর্থায়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ।

৩। জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করার জন্য রেলওয়ে ও সড়ক যোগাযোগের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নৌপথের নাব্যতা রক্ষণাবেক্ষণ। জ্বালানি মজুদের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণ।

৪। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।

উপসংহার

উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশের কাতারে সামিল হতে জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে। শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমেই বাংলাদেশের এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। আর এ লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের সরকারের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক।

ভূমিকম্পের রেশ

সূচনা

পৃথিবীতে খরা, বন্যা,ঘূর্ণিঝড় সহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে চলেছে। এর মধ্যে ভূমিকম্পই হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ। কারণ এর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের চেয়ে অনেক বেশি। মাটির নিচ থেকে হঠাৎ করেই যেন কেঁপে ওঠে পৃথিবী। কোন পূর্ব সংকেতের সুযোগ না দিয়েই ভূমিকম্প মুহূর্তেই লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে একটি পুরো জনপদ।

ভূমিকম্প কী

ভূ-অভ্যন্তরের শিলায় পীড়নের জন্য যে শক্তির সঞ্চয় ঘটে, সেই শক্তির হঠাৎ মুক্তি ঘটলে ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষণিকের জন্য কেঁপে ওঠে এবং ভূ-ত্বকের কিছু অংশ আন্দোলিত হয়। এরূপ আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী কম্পনকে ভূমিকম্প বলে। কম্পন-তরঙ্গ থেকে থেকে শক্তির সৃষ্টি হয়, তা ভূমিকম্পের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এ তরঙ্গ ভূ-গর্ভের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে উৎপন্ন হয় এবং উৎসস্থল থেকে তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভূমিকম্প সাধারণত কয়েক সেকেন্ড থেকে এক/দুই মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মাঝে মাঝে কম্পন এত দুর্বল হয় যে, তা অনুভব করা যায় না । কিন্তু শক্তিশালী ও বিধ্বংসী ভূমিকম্পে সম্পদ ও প্রাণের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

ভূমিকম্প কেন হয়

বিশেষজ্ঞরা তাঁদের গবেষণায় ভূমিকম্পের কয়েকটি কারণ সনাক্ত করেছেন।

১। ভূপৃষ্ঠে উপরের স্তরে অনেকগুলো প্লেট আছে। এগুলো আবার অনেকগুলো সাবপ্লেটে বিভক্ত। এগুলো সবসময় নড়াচড়া করছে এবং একটার সঙ্গে আরেকটার ঘর্ষণ হচ্ছে। এই ঘর্ষণের ফলে সৃষ্টি হয় ভূমিকম্পের।

২। আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ও গলিত লাভা উৎক্ষিপ্ত হবার কারণে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৩। পাহাড় বা উঁচু স্থান থেকে বৃহৎ পরিসেরে শিলাচ্যুতির কারণে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

৪। কোনো কোনো এলাকায় ভূ-পৃষ্ঠের গভীর থেকে অতিরিক্ত পানি বা তেল ওঠানোর ফলে ভূ-পৃষ্ঠের অবস্থানের তারতম্য ঘটে। ফলে ভূমিকম্প হয়।

৫। ভূ-ত্বক তাপ বিকিরণ করে সংকুচিত হয়ে ফাটল ও ভাঁজের সৃষ্টি হয়ে ভূমিকম্প হয়।

৬। নানা কারণে ভূ-গর্ভে বাষ্পের সৃষ্টি হয়। এ বাষ্প ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলে তা ভূ-ত্বকের নিম্নভাগে ধাক্কা দেয়, ফলে প্রচণ্ড ভূ-কম্পন অনুভূত হয় এবং ভূমিকম্প হয়।

৭। প্রকাণ্ড হিমবাহ পর্বতগাত্র থেকে পড়ে গিয়ে ভূ-পৃষ্ঠ কেঁপে ওঠে ও ভূমিকম্প হয়।

বাংলাদেশে ভূমিকম্প

বাংলাদেশের ভূমিকম্প বলতে বাংলাদেশ ও তার নিকটবর্তী এলাকার ভূমিকম্পকে বুঝায়। কারণ বাংলাদেশ আসলে ভারত ও মায়ানমারের ভূ-অভ্যন্তরের দুটি চ্যুতির প্রভাবে আন্দোলিত হয়। উল্লেখ্য বাংলাদেশ ভারতীয়, ইউরোপিয় এবং মায়ানমারের টেকটনিক প্লেটের মাঝে অবস্থিত। এই প্লেটগুলোর নড়াচড়ার কারণে আমাদের দেশে প্রায়ই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। তাছাড়া ভারতিয় ও ইউরেশিয় প্লেট দুটো হিমালয়ের পাদদেশে আটকা পড়ে রয়েছে এবং ১৯৩৪ সালের পর তেমন কোন বড় ধরনের নড়াচড়া প্রদর্শন করে নি। এ কারণে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন এ প্লেট দুটো হয়তো নিকট ভবিষ্যতে নড়ে ওঠবে যা বড় ধরনের ভূমিকম্পের কারণ হবে। বাংলাদেশে ৮টি ভূ-তাত্ত্বিক চ্যুতি এলাকা রয়েছে, যথা বগুড়া চ্যুতি এলাকা, রাজশাহীর তানোর চ্যুতি এলাকা, ত্রিপুরা চ্যুতি এলাকা, সিতাকুণ্ড টেকনাফ চ্যুতি এলাকা, হালুয়াঘাটের ডাওকি চ্যুতি এলাকা, ডুবরি চ্যুতি এলাকা, চট্টগ্রাম চ্যুতি এলাকা, সিলেটের শাহজীবাজার চ্যুতি এলাকা, রাঙামাটি চ্যুতি এলাকা। এসব 'ভূ-চ্যুতি'ই বাংলাদেশের ভূমিকম্পের প্রধান কারণ।

প্রাকৃতিকভাবেই কার্বন চক্রের প্রভাবে ভূমিকম্প হয়ে থাকে, বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। এদেশের ভিতরে ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ভূমিকম্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯০০ খ্রি. থেকে ২০০৪ খ্রি. পর্যন্ত শতাধিক ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে, যার মধ্যে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের পরেই হয়েছে ৬৫ টিরও বেশি। অর্থাৎ গত ৩০ বছরে ভূমিকম্প সংঘটনের মাত্রা বেড়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মানমন্দিরে মে ২০০৭ থেকে জুলাই,২০০৮ পর্যন্ত কমপক্ষে ৯০টি ভূকম্পন নথিভূক্ত হয় যার ৯টিরই রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল ৫ এর ওপরে। গত ১৬ মাসের ব্যবধানে পাঁচটি শক্তিশালী ভূমিকম্পের মুখোমুখি হয়েছে দেশ। গত বছর ২৫ এপ্রিল তারিখে সংঘটিত নেপালের ৭.৯ মাত্রার ভূমিকম্পের প্রচণ্ড আঘাত বাংলাদেশকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। মাত্র ১৫ কিলোমিটার গভীর থেকে উৎপন্ন হওয়ায় এই ভূমিকম্প নেপালে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এর রেশ না কাটতেই ১২ মে তারিখে নেপালে আবারও ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। ঢাকা থেকে দুটি ভূমিকম্পের দূরত্ব ছিল যথাক্রমে ৭শত ও ৬শত কিলোমিটার। ২০১৬ সালের ৪ জানুয়ারি তারিখের ভোরে ৬.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে সারা দেশ, যার উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে ৩৪৩ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ভারতের মনিপুর রাজ্যে। এর রেশ না কাটতেই গত পয়লা বৈশাখের আগের দিন ১৩ এপ্রিল,২০১৬-এর সন্ধ্যায় ৬.৯ মাত্রার আরেকটি শক্তিশালী ভূমিকম্পে কম্পিত হয় এ দেশ। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে ৪৬৫ কিলোমিটার পূর্বে মিয়ানমারের দক্ষিণ-পূর্বেও মাইলাক শহরের কাছে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এর কেন্দ্রের গভীরতা ছিল ১৩৫ কিলোমিটার। এরপর এ বছরের ২৩ ও ২৪ আগস্টে মৃদু ভূমিকম্পের পর ২৪ আগস্টে বাংলাদেশে ৬.৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়, যার উৎপত্তিস্থল ছিল মায়ানমারের মধ্যাঞ্চলে এবং কেন্দ্র ছিল ভূ-পৃষ্ঠের ৮৪.১ কিলোমিটার গভীরে। ঢাকা থেকে এর দূরত্ব ছিল ৫২৬ কিলোমিটার। এভাবে মৃদু ও মাঝারি ভূমিকম্পে দফায় দফায় কেঁপে ওঠছে বাংলাদেশ। এ পরিপ্রেক্ষিতে জনমনে আতংক তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ শক্তিশালী ভূমিকম্পগুলো দেশ থেকে অনেক দূরে ও মাটির অনেক গভীরে কেন্দ্র হওয়ায় বড় ধরণের বিপর্যয় ডেকে আনে। তবে দেশের ভেতর থেকে কম গভীরতায় উৎপন্ন শক্তিশালী ভূমিকম্পের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আর এ ধরনের ভূমিকম্প দেশে মানবিক বিপর্যয় সৃস্টি করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে শুধু ভূমিকম্প নয়, ভূমিকম্পের পর দেশের উপকূলীয় এলাকা ঘিরে ভয়াবহ সুনামি সৃষ্টির জন্য সাইসমিক গ্যাপ বিরাজমান রয়েছে, যা আমাদের জন্য অশনিসংকেত।

অনেক ভূ-তাত্ত্বিক ঘন ঘন ছোট ছোট ভূমিকম্পন সংঘটনকে বড় ধরনের ভূমিকম্পের পূর্বাভাস বলে উল্লেখ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লেমন্ট-ডোহের্টি আর্থ অবজারভেটরির ভূ-তাত্ত্বিকেরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশের নিচে জমে ওঠা টেকটনিক চাপ জমে উঠছে কমপক্ষে ৪০০ বছর ধরে। এই চাপ যখন মুক্ত হবে তখন সৃষ্ট ভূমিকম্পের

মাত্রা হবে প্রায় ৮.২ রিখটার, এমন কী তার মাত্রা বেড়ে ৯ রিখটারেও পৌঁছতে পারে। (জুলাই, ২০১৬)। প্রায় ১৪ কোটি মানুষ এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন।

বাংলাদেশকে ভূমিকম্পের তীব্রতার ভিত্তিতে তিনটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। মাত্রাভেদে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার অবস্থান নিম্নরূপ :

জোন-১ : পঞ্চগড়, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সম্পূর্ণ অংশ এবং ঠাকুরগাঁও, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজারের অংশবিশেষ।

জোন-২ : রাজশাহী, নাটোর, মাগুরা, মেহেরপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফেনি এবং ঢাকা।

জোন-৩ : বরিশাল , পটুয়াখালী এবং সব দ্বীপ ও চর।

জোন ১-এর অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের ৪৩% এলাকা উচ্চ মাত্রার ঝুঁকিতে, জোন ২-এর অন্তর্ভুক্ত ৪১% এলাকা মধ্যম মাত্রার ঝুঁকিতে এবং ১৬% এলাকা নিম্ন ঝুঁকিতে রয়েছে। জোন ১-এ অবস্থিত বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা সিলেট এবং তৎসংলগ্ন এলাকা ভূমিকম্প প্রবণ। এর পরের অংশগুলোও যেমন ঢাকা ও রাজশাহী সক্রিয় ভূমিকম্প এলাকায় থাকার কারণে মারাত্মক ভূমিকম্পের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতে পারে।

জাতিসংঘ পরিচালিত 'রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট টুলস ফর ডায়াগনসিস অফ আরবান এরিয়াস এগেইন্সট সাইসমিক ডিজাস্টার' জরিপে ভূ-তাত্ত্বিক ঝুঁকিপূর্ণ বিশ্বের ২০টি শহরের মধ্যে ঢাকা অন্যতম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক এক গবেষণায় দেখা গেছে ঢাকার ভূমিতে বিভিন্ন প্রকার মাটি (লাল মাটি, নরম মাটি ইত্যাদি) রয়েছে। ঢাকার সম্প্রসারিত অংশে জলাশয় ভরাট করে গড়ে তোলা হয়েছে আবাসন এলাকা। ভূমিকম্পের সময় নরম ও ভরাট করা এলাকার মাটি ভূমিকম্পের তরঙ্গকে বাড়িয়ে দেয়। তাই আলগা মাটি সমৃদ্ধ ঢাকার বর্ধিতাংশকে গবেষকরা যথেষ্ঠ ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছেন। সরকারি তথ্যসূত্র মতে, ঢাকায় রাতের বেলায় ৭ থেকে ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ৯০,০০০ লোক এবং দিনের বেলায় হলে ৭০,০০০ লোক হতাহত হবে। প্রায় ৭২,০০০ দালান সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং ৮৫,০০০ ভবন মাঝারি ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যার আর্থিক মূল্য দাঁড়াবে ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ভূমিকম্প মোকবেলায় পদক্ষেপ

ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবেলায় আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত দুটি। এক. ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাকে নিম্নতম পর্যায়ে রাখা। দুই. ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দেওয়া। এ লক্ষ্যে ভূমিকম্প পূর্ব, ভূমিকম্প কালীন ও ভূমিকম্পের পরে করণীয় নির্ধারণ করে আমাদের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। পদক্ষেপসমূহ হলো–

১। পরিবারের সবাইকে ভূমিকম্পের জরুরি অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
২। ভূমিকম্প মোকাবেলায় সক্ষম বাড়িঘর, দালান ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা।
৩। পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ঘরের বড় বড় ও লম্বা আসবাবপত্রগুলোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে।
৪। বিছানার পাশে সব সময় টর্চলাইট, ব্যাটারি এবং জুতা রাখা।
৫। ধুলাবালি থেকে বাঁচার জন্য আগেই রুমাল বা চাদরের ব্যবস্থা রাখা।

সরকারি পদক্ষেপ

১। পুরনো নড়বড়ে দালানগুলো অপসারণ অথবা প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
২। ভূমিকম্পের সময় করণীয় সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
৩। ভূমিকম্প সহনীয় করে বিল্ডিং নির্মাণ নিশ্চিতকরণের জন্য তদারকি নিশ্চিত করা ।
৪। রাস্তা প্রশস্ত ও উন্মুক্ত মাঠ বাড়ানো নিশ্চিত করা।
৫। দ্রুত উদ্ধার কাজের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির যোগান নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ উদ্ধারকর্মী সৃষ্টি করা।
৬। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সচেতনতামূলক ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

মনে রাখতে হবে, " প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো।"

ভূমিকম্প হলে করণীয়

১। ভূমিকম্প হলে টেবিল, চেয়ার, বিছানার নিচে আশ্রয় না নিয়ে ঠিক পাশে আশ্রয় নিতে হবে।
২। দৌড়াদৌড়ি বা হুড়াহুড়ি বা ধাক্কাধাক্কি করে সিঁড়ি দিয়ে না নামা।
৩। কখনো সিঁড়িতে আশ্রয় না দেওয়া।
৪। বাসার একেবারে ভিতরের দিকে রুমে না থেকে বাইরের দেয়ালের বিমের কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করা।
৫। উঁচু দালান, বড় গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি ও গ্যাস লাইনের কাছাকাছি আশ্রয় না নেওয়া।
৬। ভূমিকম্পের সময় গাড়িতে থাকলে দ্রুত নেমে পড়া এবং বাসার বাইরে থাকলে বাসায় না ঢোকা।
৭। কাচের জানালা, আলমারি, ফ্রিজের কাছাকাছি আশ্রয় না নেওয়া।
৮। ভূমিকম্পের সময় লিফট ব্যবহার না করা।
৯। প্রথম ভূমিকম্পের পর পরাঘাতের আগেই গ্যাস, বিদ্যুৎ– এসবের মেইন সুইচ বন্ধ করে দেওয়া।
১০। দেয়াশলাই জ্বালানো যাবে না।

উপসংহার

ভূমিকম্প প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর একটি। ভূ-তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার কারণেই এটি ঘটে থাকে। ভূমিকম্প থামানোর ক্ষমতা কারোর নেই; কিন্তু ভূমিকম্প মোকাবেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এর ধ্বংসের ভয়াবহতা কমানো সম্ভব। তাই এ বিষয়ে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে জরুরি উদ্যোগ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজনীয়।

সম্প্রীতি

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ নিজের অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশের প্রয়োজনেই গড়ে তুলেছে সমাজ। আর সমাজ গড়ে তোলার নিয়ামক হিসেবে মানুষকে ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা বিসর্জন দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও পরার্থপরতার নীতি অবলম্বন করতে হয়েছে। উন্নতি, প্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে মানুষ সামবায়িক কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়েছে। ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোত্রে বিভক্ত হয়েও মানুষ বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতার পথে হাঁটেনি; বরং পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সভ্যতার চাকাকে গতিময় করেছে। আজকের সভ্যতা সকল মানুষের নিরলস প্রচেষ্টার অনন্য ফসল; এ সভ্যতায় সকলের সমান উত্তরাধিকার। আর মানবসভ্যতার বুনিয়াদ নির্মিত হয়েছে প্রেম, মৈত্রী, শান্তি ও সম্প্রীতির ভিত্তিমূলে দাঁড়িয়ে। উল্লেখ্য, কিছু স্বার্থান্ধ মানুষ নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষে মানুষে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বিভেদ সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়ে মানবসভ্যতার স্থিতি ও সমৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

সম্প্রীতি কী

সম্প্রীতি শব্দের আভিধানিক অর্থ সদ্ভাব, সৌহার্দ্য, প্রেম, প্রণয়, সন্তোষজনক আচরণ, সুভাব, সন্তোষ ইত্যাদি। প্রেম, সৌহার্দ্য, সদ্ভাব এসব সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পারস্পরিক শান্তিময় সহাবস্থানই হচ্ছে সম্প্রীতি । অন্যভাবে বলা যায়, মানুষে মানুষে প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধনই হচ্ছে সম্প্রীতি। ধর্মে-বর্ণে-জাতি-গোত্রে বিভিন্ন পরিচয় থাকলেও মানুষের চূড়ান্ত পরিচয় 'মানুষ' হিসেবে। স্বীয় স্বাতন্ত্র্য ও ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকেও প্রতিটি শুভবোধসম্পন্ন মানুষের গভীরতর প্রত্যয় এই : "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা

মানুষ সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েই সভ্যতা নির্মাণে ব্রতী হয়েছে। মানবসভ্যতার যতগুলো অর্জন, তার সবই সমগ্র মানবকূলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ফসল। মানুষের মহৎ কোন আবিষ্কার বা সৃষ্টি কোন জাতি, গোত্র বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; দেশ-কাল-সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ বেড়া ডিঙিয়ে তা হয়ে ওঠে বিশ্বের সকলের। মানব প্রগতির স্রোতোধারায় রয়েছে সকল জাতির সকল ধর্মের, বর্ণের সম্মিলিত মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার অবদান। সকল শুভবোধসম্পন্ন মানুষের ঐকান্তিক চাওয়া হলো শান্তিময়, সমৃদ্ধ বিশ্ব। আর এর জন্য দরকার ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের অকৃত্রিম ভালবাসা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, পরমতের প্রতি সহিষ্ণু হওয়া, নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ

ভাবার অহম্ ত্যাগ করা, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পরিহার করা। অন্যের মনোভাব, অভিমত, ধারণা বা বিশ্বাসের সঙ্গে একমত না হতে পারলেও তার প্রতি সহানুভূতি, সহনশীলতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা অপরিহার্য। আধুনিক বিশ্ব অগ্রসর হচ্ছে বহুমত ও বহুপথকে যুগপৎ ধারণ করে। শান্তিময়, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ পৃথিবী নির্মাণের জন্য সম্প্রীতির বন্ধনের বিকল্প নেই। কোন কারণে সম্প্রীতি নষ্ট হলে সমাজে বিভেদ বাড়ে, বাড়ে অন্যের ক্ষতি করার পাশবিক উল্লাস। পরিণামে দেখা দেয় সংঘর্ষ ও হানাহনি। অশান্তির বিষ প্রবেশ করে সমাজদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে; সামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথ হয়ে যায় রুদ্ধ। মানবকল্যাণের বৃহত্তর স্বার্থে যে কোন মূল্যে সমাজে সম্প্রীতি রক্ষা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে ভলতেয়ারের বক্তব্য স্মরণীয় : "তোমার কথার সঙ্গে আমি একমত হতে না পারি, কিন্তু তোমার মত প্রকাশের স্বাধীনতা আমি আমার জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করব।" বস্তুত পরমত সহিষ্ণুতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সম্প্রীতির বীজ।

রক্তক্ষয়ী বিশ্ব-পরিস্থিতি

শুভবোধসম্পন্ন মানুষেরা যেমন মানুষে মানুষে সম্প্রীতি রক্ষায় নিবেদিত; এর বিপরীত পিঠে তৎপর রয়েছে সম্প্রীতি বিনষ্টকারী স্বার্থান্ধ অশুভ শক্তি। ব্যক্তি বা মহলবিশেষ ক্ষমতার লোভে, অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে অথবা গোষ্ঠী-স্বার্থে ভেদবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে গড়ে তুলেছে বিভেদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর; বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে বিপরীত পক্ষকে ঘায়েল করার প্রাণঘাতী ফিকিরে লিপ্ত হয়েছে; রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বা যুদ্ধ বাঁধিয়ে রক্তাক্ত করছে জনপদ। এভাবে যুগে যুগে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সংঘর্ষে, যুদ্ধে, দাঙ্গায় কত জনপদ ধ্বংস হয়েছে, কত মানুষ নিহত হয়েছে তার কোন পরিসংখ্যান নেই। এই দ্বন্দ্বে সুবিধাবাদী গোষ্ঠী সহজ ও কার্যকর ইন্ধন হিসেবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করছে ধর্মকে। হীন সাম্প্রদায়িকতার মূল নিহিত রয়েছে বিভিন্ন ধর্মের গোড়ামি ও অন্ধবিশ্বাসে। ধর্ম-ব্যবসায়ীদের কারণেই মানুষে মানুষে সীমাহীন বিভেদ ও বিদ্বেষের অগ্নিদহন। অথচ প্রতিটি ধর্মের গোড়ার কথা মানবকল্যাণ ও শান্তি। প্রত্যেকের ধর্ম প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে পালন করবে এবং অন্যকেও নির্বিঘ্নে ধর্মপালনের সুযোগ করে দেবে – এটাই প্রতিটি ধর্মের নৈতিক শিক্ষা। সকল ধর্মই পারস্পরিক সহাবস্থান ও সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলামে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আছে। ধর্মের নামে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো, হানাহানি ও রক্তক্ষয়ে লিপ্ত হওয়া ধর্মের মূল চেতনাকেই ধ্বংস করে। পরিতাপের বিষয় হলো- বিশ্ব আজ অশান্ত, বিধ্বস্ত, রক্তরঞ্জিত ধর্মীয় উগ্রপন্থার কারণে। বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের নোংরা হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে ধর্ম। রাজনীতিবিদেরা ধর্মের মতো স্পর্শকাতর বিষয়কে ইস্যু বানিয়ে সহজেই হাসিল করে নিচ্ছে নিজের স্বার্থ ও প্রভাব। এছাড়া জাতি-বৈরিতা ও বর্ণ-বিদ্বেষ থেকেও বহু জাতি ও রাষ্ট্র যুদ্ধে, সংঘর্ষে, দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ছে। ফলত লজ্জিত হচ্ছে মানবতা।

ক্ষমতালোভী, জাত্যাভিমানী ও আধিপত্যবাদী নরপশুদের সহিংসতায় কালে কালে, দেশে দেশে রক্তরঞ্জিত ও কলঙ্কিত হয়েছে মানবেতিহাস। কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের সহিংসতা মানবতার জন্য এক গভীর ক্ষত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রমত্ত আগ্রাসনে নির্মূল হতে হয়েছে আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান ও অস্ট্রেলিয় আদিবাসীদের। প্রবল জাত্যাভিমানী ও ক্ষমতালোভী হিটলারের গ্যাসচেম্বারে নিহত হতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে। আবার ইহুদিরাই সকল প্রকার ন্যায়নীতি আর মানবতার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে প্যালেস্টাইনে নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। কতিপয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশ্ব-আধিপত্য বজায় রাখার কৌশল হিসেবে এই নৃশংসতাকে সমর্থন করে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে ক্ষমতার দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ইংরেজরা বিবেকবর্জিত দমনপীড়নের আশ্রয় নিয়েছে; ভ্রাতৃপ্রতিম দুই সম্প্রদায়– হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কৌশলে বিদ্বেষ ছড়িয়ে পরস্পরকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে সংঘটিত হয়েছে অসংখ্য ভয়াবহ দাঙ্গা। ভারতকে বিভক্ত করার মাধ্যমে বিশ্বের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় এ জনপদে অশান্তির স্থায়ী বীজ রোপণ করে দিয়ে গেছে। জাতিগত সহিংসতার কারণে মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে বসনিয়া-হার্জেগোভেনিয়ায়, সোমালিয়ায়, মায়ানমারে এবং আরো বহু দেশে। ধর্মীয় উগ্রবাদীদের সহিংসতায় মধ্যপ্রাচ্য আজ বিপন্ন। সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তানে সহিংসতায় প্রতিনিয়ত নিহত হচ্ছে মানুষ; মানুষের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে ধরণীর বুক। ধর্মীয় উগ্রপন্থা ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বময়; উগ্রপন্থীদের হাত থেকে আজ কেউ নিরাপদ নয়। ধর্মীয় উগ্রপন্থা আজকের পৃথিবীকে এক গভীর সংকটে নিপতিত করেছে।

বাংলাদেশে সম্প্রীতির ঐতিহ্য ও বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের মানুষের মনের জমিন এদেশের পলিমাটির মতোই নরম; হিংসা, হানাহানি, হিংস্রতা, ক্রূরতার সঙ্গে এদেশের মানুষের সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়, সম্পদে-বিপদে যূথবদ্ধ থাকার এক অবিনশ্বর চেতনা বাঙালি

জাতি তার সত্তার গভীরে লালন করে। ধর্ম-বর্ণ-জাতির চেয়ে এখানে মানুষের পরিচয়ই সবচেয়ে বড়। মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাসের কণ্ঠে বাঙালির শাশ্বত বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে –– 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই এদেশের মানুষ পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনের হাজার বছরের ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। বিভিন্ন সময়ে স্বার্থান্ধদের প্ররোচনায় এই সম্প্রীতির বন্ধনে কখনো কখনো মোচড় লেগেছে, কিন্তু ছিন্ন কখনোই হয়নি। ব্রিটিশদের ভারতশাসনে বিভাজনের ঔপনিবেশিক নীতি আমাদের হাজার বছরের সম্প্রীতির বন্ধনকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মুসলমানদের আনুকূল্য দেওয়ার অজুহাতে ১৯০৫ সালে বঙ্গ-বিভক্তির মধ্য দিয়ে হিন্দু-মসলমান দুই সম্প্রদায়কে কার্যত বিভক্ত করা গেছে। ১৯১২ সালে বঙ্গ আবার একীভূত হলেও ভাঙার রেখাটি রয়েই গেছে। এরপর ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই বিভাজন দাঙ্গায় রূপ নিয়েছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অনিবার্য পরিণাম হিসেবে ১৯০৫ সালের রেখা ধরেই বাংলা আবার বিভক্ত হয়। এরমধ্যে সম্প্রীতির বাংলায় ঘটে গেছে ভয়াবহ দাঙ্গা; লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে এই অহিংসার ভূমি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই বাঙালি তার সত্তানিহিত সম্প্রীতির চেতনায় ফিরে আসে। এ যেন এক মহাঘোর কাটিয়ে আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসা। বাংলা ভাষার ওপর আঘাতেই বাঙালি জাতিসত্তার পরিপূর্ণ পুনর্জাগরণ ঘটে। পাকিস্তানিদের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির প্রতিবাদী হওয়ার শক্তি জুগিয়েছে এর অন্তর্নিহিত সম্প্রীতি চেতনা। পাকিস্তানি শাসকেরা বহু ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে এ সম্প্রীতি চেতনাকে বিনষ্ট করার প্রয়াস হিসেবে। ১৯৬৪ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির একটি চেষ্টা চালানো হয় পাকিস্তানি শাসকদের প্ররোচনায়; কিন্তু বাঙালি জাতি সেই অপচেষ্টা প্রবলভাবে প্রতিহত করেছে। বাঙালি জাতির সম্প্রীতি চেতনার ভিত্তিতেই ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান-ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সকলের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পটভূমিতেই গড়ে উঠেছে স্বাধীন বাংলাদেশের বুনিয়াদ। স্বাধীন বাংলাদেশেও পাকিস্তান-পন্থী কিছু দোসরের প্ররোচনায় সময়ে সময়ে সম্প্রীতির চেতনায় চিড় ধরেছে। কিন্তু সকল অপচেষ্টাকে পরাভূত করে বাঙালির সম্প্রীতিবোধ অটল আছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী জঙ্গীবাদের উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশেও এর প্রসার ঘটানোর একটি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলমান আছে। কিছু জঙ্গীগোষ্ঠী ইসলামের ভুল ব্যাখ্যায় প্ররোচিত করে যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করার মাধ্যমে কথিত জিহাদে উদ্বুদ্ধ করছে। মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত মতাদর্শীদের সহিংসতায় রক্তাক্ত হচ্ছে এ জনপদ; গুলশানের হলি আর্টিজানের ঘটনা এর সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত। কিন্তু এদের নৃশংসতাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে এদেশের মানুষ, তাদের করুণ পরিণতিতে কেউ কোনো অনুকম্পা দেখায়নি, এমনকি তাদের মা-বাবারাও নয়। এটিই সম্প্রীতির বাংলাদেশের আসল পরিচয়।

বাংলাদেশে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য করণীয়

বাংলাদেশের সহিংসতারইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সমাজের ক্ষুদ্র একটি স্বার্থান্ধ গোষ্ঠী তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে এদেশের ধর্মানুরাগী মানুষদের কাছে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে অন্য ধর্মের মানুষদের প্রতি বিদ্বেষ তৈরি করেছে। এই প্রবণতা রোধ করার জন্য ধর্মের সঠিক শিক্ষা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। কুসংস্কারমুক্ত, মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন, বিজ্ঞান-মনস্ক মানুষ তৈরির শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাস শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। দেশের সকল নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থানের সমান সুযোগ তৈরি করতে হবে। সামাজিক ন্যায় ও রাষ্ট্রীয় সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। নীতি-নির্ধারকদের মনে রাখতে হবে, পরিপার্শ্বে যখন অন্যায়, অত্যাচার জুলুম চলতে থাকে, তখন যুবকদের মনে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয় এবং এ থেকে পরিত্রাণের জন্য এরা পথ খুঁজতে থাকে। এ সুযোগটিই নিয়ে থাকে সুবিধাবাদীরা। পারিবারিক পর্যায়েও সুস্থতার সংস্কৃতি চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের রয়েছে সম্প্রীতির এক গর্বিত ইতিহাস। সম্প্রীতির ভিতে গড়ে উঠা বাংলাদেশ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, সংঘাতপূর্ণ ও হিংসাত্মক পৃথিবীতে সম্প্রীতির পতাকা হাতে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দেবে ––এটাই এদেশের সকল মানুষের স্বপ্ন। এর জন্য সুরক্ষিত করতে হবে আমাদের সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে। স্বার্থান্ধ ষড়যন্ত্রকারীরাও থেমে থাকবে না, তাদের অপচেষ্টা চলতেই থাকবে; তবে বাঙালির শাণিত চেতনা তাদের অপচেষ্টাকে শক্তহাতে প্রতিহতও করবে––ইতিহাস আমাদেরকে এভাবেই আশ্বস্ত করে।

নারীর ক্ষমতায়ন/ অধিকার

ভূমিকা

"কোন কালে একা হয়নি ক জয়ী পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয় লক্ষ্মী নারী ।"

নারীর প্রতি এই বন্দনায় প্রতিফলিত হয়েছে গৃহকোণে বন্দী নারীর নিভৃত ভূমিকার কথা। যদিও এখানে নারীর প্রেরণা ও শক্তিদানের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, এই পরিচয়েও নারী শেষ পর্যন্ত অন্তরালের নারীই; সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতির সমন্বয়ে বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে নারীর প্রত্যক্ষ ও স্বাধীন-সার্বভৌম ভূমিকা অনুপস্থিতই থেকে যায়। গৃহকোণ সামলানো, সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালন এবং আরাম-আয়েশ ও বিনোদনের বিচিত্র উপচার যোগানো – নারীর অন্তরালের এই নিরন্তর কর্মযজ্ঞ পুরুষের শীর্ষস্পর্শী সাফল্যের গোড়ার কথা। কিন্তু নারী পুরুষের সাফল্যের সিঁড়ি নির্মাণ করতে গিয়ে নিজেই যে সিঁড়ি হারিয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের মতো কেউ কেউ উদারতাবশত নারীর অন্তরালের অবদানের স্বীকৃতিটুকু দেয়; বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তো ঘটে উল্টোটা – সামান্যতম ত্রুটির জন্যও নারীর প্রাপ্তি হয় অপমান, লাঞ্ছনা আর নির্যাতন। প্রেরণা আর শক্তিদান – ক্ষমতার মধ্যে পড়লেও এটুকুই নারীর শেষ ক্ষমতা নয়; নারী যে পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমান সক্ষমতায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র অঙ্গনে অবদান রাখতে পারে তার উদাহরণ অল্প হলেও বিরল নয়। মাদাম কুরি, মাদার তেরেসা, ইন্দিরা গান্ধী, কল্পনা চাওলা প্রমুখ নারী আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ পেলে নারী মানবসভ্যতার উন্নয়ন ও বিকাশে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাঁরা নারীর সক্ষমতার একেকটি উজ্জ্বল ধ্রুবতারা।

নারীর ক্ষমতায়ন কী

নারীর ক্ষমতায়ন মানে একজন শিক্ষিত নারীর নিজের মেধা-মনন-প্রজ্ঞা ও সৃজনক্ষমতাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে প্রয়োগ করার ক্ষমতা। নারীর স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা গেলেই নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হয়।

নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা

একবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতাময় বিশ্বে প্রতিটি দেশই তাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশ্বে মানুষের চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছুই নেই। একথা সবারই জানা, উন্নত দেশগুলোর উন্নতির মূলে রয়েছে সে দেশগুলোর মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নিরন্তর চর্চা। ঐ দেশগুলোতে শুধু পুরুষকেই মানবসম্পদে রূপান্তর করা হয় নি, মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধাংশ নারীকেও সম্পদ বিবেচনায় সমাজের মূলস্রোতে টেনে এনেছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের মতো উন্নয়নকামী দেশগুলোকে নারীর মেধা, মনন ও সৃজনীশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাদেরকে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ভূমিকা পালনের পূর্ণ সুযোগ করে দিতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে নারীর ক্ষমতায়ন আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোতে পরিদৃষ্ট হলেও তার পরিপূর্ণ সুফল মিলবে সমগ্র নারীসমাজকে ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়ে।

বাংলাদেশে নারীর ঐতিহ্যগত অবস্থান

ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় কারণেই সুদূর প্রাচীন কাল থেকে নারীরা মর্যাদা বঞ্চিত। যতদূর জানা যায়, প্রাচীন বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে নারী-পুরুষে প্রান্তরের সমতা ছিল। কিন্তু কালের পরিক্রমায় উদ্বৃত্ত সম্পদের মালিকানা, উত্তরাধিকার ও সামাজিক আধিপত্যের প্রশ্নে নারী-পুরুষে বৈষম্য সৃষ্টি হতে থাকে। এক্ষেত্রে নিয়ামক হয়েছে নারী-পুরুষের শারীরিক গঠন ও শক্তির পার্থক্য। এরই এক পর্যায়ে নারী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং এই অর্থনৈতিক মালিকানা থেকে বঞ্চিত হওয়ার মধ্য দিয়ে নারীর চূড়ান্ত পতন ঘটে। এই পর্যায়ে সে নিজেও নিজের রইলো না, গৃহের অন্যান্য সম্পদের মতো পুরুষের সম্পত্তিতে পরিণত হলো। শিক্ষা তার জন্য নিষিদ্ধ হলো, ঘরের বাইরের জগৎ তার জন্য নিষিদ্ধ জগতে পরিণত হলো। ঘরে অবরুদ্ধ থেকে রান্না-বান্না, গৃহস্থালির কাজ করবে, পুরুষের যৌন চাহিদা পূরণ করবে আর পুরুষের সম্পদের উত্তরাধিকার হিসেবে সন্তান, বলা বাহুল্য পুত্রসন্তান জন্মদান করবে। এক্ষেত্রে নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা মূল্যহীন, পুরুষের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। সেবাব্রতী ও সন্তানোৎপাদক– এই ভূমিকায় সাফল্যের নিরীখে নারীর মর্যাদা নির্ধারিত হতো। প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন সময়ে বহু জাতিগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে,বহুবার ক্ষমতার পালাবদল ও ধর্মান্তরণের ঘটনা ঘটেছে কিন্তু নারীর প্রতি

দৃষ্টিভঙ্গীর তেমন কোন হেরফের হয়নি। বিগত দুয়েক শতকে ইংরেজ শাসন ও ইউরোপিয় শিক্ষার প্রভাবে নারীর প্রতি মর্যাদা প্রদানের আওয়াজ ওঠে। পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও অনুকূল পরিবেশের সুযোগে কোন কোন নারী নিজের ক্ষমতা ও ভূমিকার প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হলেও তা সমগ্র জনগোষ্ঠীর বিবেচনায় মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। এখনো অনেক শিক্ষিত পুরুষ প্রাচীন মনেবৃত্তিই লালন করে নারীর ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনে। এছাড়া সাংসারিক কাজকর্ম – যেমন সন্তান পালন, গৃহস্থালির কাজ যেগুলো বিরক্তিকর ও কষ্টের, সেগুলো এড়িয়ে চলার মানসিকতা এক্ষেত্রে সক্রিয়। পুরুষের স্বেচ্ছাচারী ও স্বার্থান্বেষী মানসিকতার কারণে নারীর ক্ষমতায়ন অনেকাংশে বিঘ্নিত হচ্ছে। জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারীর বিপুল কর্মশক্তি ও মেধাশক্তির অপচয়ের কারণে আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়নের বৈশ্বিক উদ্যোগ

বিশ্বব্যাপী নারী উন্নয়ন নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য জাতিসংঘ নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছে। ৭০-এর দশক থেকে জাতিসংঘ নারীর মর্যাদার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ১৯৭৫ সারকে নারী বর্ষ এবং ১৯৭৫-১৯৮৫ কে নারী দশক হিসেবে পালন করে নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে জোরদার করে। জাতিসংঘের আয়োজনে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে চারটি বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের উদ্যোগ :

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। নারী উন্নয়নের প্রয়োজনে বিশেষ বিধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সংবিধানে। নারীর উন্নয়নে বাংলাদেশে মহিলা বিষয়ক আলাদা মন্ত্রণালয় রয়েছে। প্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সরকারি চাকরিতে নারীর জন্য ১০% কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নারীর জন্য ৬০% কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে পুলিশ, বিচার বিভাগ সহবিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে সচিব পর্যন্ত মহিলা রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা সহ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীত্বে নারী দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৪৫টি সংরক্ষিত আসনের বিধান করা হয়েছে। এ ছাড়া সংসদ নির্বাচনে সরাসরি প্রতিযোগিতায় নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। নারী শিক্ষাকে স্নাতক পর্যন্ত অবৈতনিক করা হয়েছে এবং তাদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় এ সব উদ্যোগের কারণে নারীরা আজ সমাজে বেশ প্রভাবশালী অবস্থানে রয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এখনো সবচেয়ে বাঁধা। নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টিকে এখনো পুরুষেরা খোলা মনে গ্রহণ করতে পারে না। নারীর ক্ষেত্রে এখনো শ্রম বৈষম্য বিদ্যমান। নারীর গৃহস্থালির কাজের মর্যাদা এখনো অস্বীকৃত। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় নারীরা নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়নের উপায়

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন নারীর আত্মনিয়ন্ত্রণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। আশার কথা হলো, সাম্প্রতিক সময়ে প্রথম আলো পত্রিকার এক জরিপে দেখা গেছে, " অর্থনৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান যা-ই হোক অথবা পড়াশোনায় যেমনই হোক, মেয়েরা লেখাপড়া শেষ করে প্রতিষ্ঠিত হতে চান।" (প্রথম আলো, ৬ সেপ্টেম্বর,২০১৬)। জরিপে অংশ নেওয়া ১৮৮ জন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র দুজন পড়াশোনা শেষ করে কিছু করতে চায় না, সংসারে মনোযোগ দিতে চায়। আগে মেয়েদের মধ্যে এ মানসিকতাই প্রবল ছিল, যা নারীর ক্ষমতায়নের প্রথম বাঁধা। বর্তমানে যে সকল মেয়েরা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে, তারা প্রায় সবাই প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, হতে চায় পরিবারের কাণ্ডারি, নিতে চায় নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত, সমাজের জন্যও কাজ করতে চায় তারা। নিজের, পরিবারের ও সমাজের দায়িত্ব নেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই নিহিত রয়েছে নারীর ক্ষমতায়নের মূলমন্ত্র। নারীরা স্বাবলম্বী হলে শুধু পরিবারে নয়, সমাজেও তার একটি সম্মানজনক অবস্থান তৈরি হয়। পারিবারিক-অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি নারীর নিজেরও সক্ষমতা বাড়ে। মা-বাবা,পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো মেয়েদের এই চাওয়াগুলোকে পূরণের জন্য তাদের পাশে থাকা, তাদেরকে সমর্থন দেওয়া ও অনুপ্রাণিত করা, তাদের মেধাবিকাশে আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা ।

নারীর ক্ষমতায়নের সুফল

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নারীর অবদান অপরিসীম। নারীর ক্ষমতায়নের সুফল বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩র তথ্যমতে, দেশের অর্থনীতির মূলধারা কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে ১ কোটি ৬৮ লাখ নারী কাজ করছেন এবং প্রতি বছর গড়ে যোগ হচ্ছেন আরো দুই লাখ নারী। এ ছাড়া উৎপাদন খাতে কাজ করছেন ২২ লাখ ১৭ হাজার নারী। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-ও এক গবেষণাপত্রে দেখা যায়, ১৯৯৫-৯৬ সালে মোট শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ১৫ দশমিক ৮ শতাংশ; ২০১১-১২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৯ দশমিক ১ শতাংশ। তাদের উপার্জন সংসারের মোট উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সচ্ছলতা বৃদ্ধি করছে; এতে জীবনমানের উন্নতি হচ্ছে। পরিবারে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসার সুযোগ বাড়ছে; একই সঙ্গে উন্নত হচ্ছে দেশ।

উপসংহার

দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী। নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হলে পরিবার ও সমাজের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নয়নেও এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসবে। এ জন্য নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে।

গুণগত শিক্ষা

সূচনা

শিক্ষা প্রসঙ্গে সুপ্রচলিত প্রবাদ, 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। অর্থাৎ, মেরুদণ্ড ছাড়া যেমন দেহ চলে না, তেমনি শিক্ষা ছাড়া দেশ চলে না। জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার সম্প্রসারণে ব্যাপক উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে। শিক্ষার হার বাড়ছে ব্যাপকভাবে। সরকার জাতীয় বাজেটে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এত কিছুর পরেও শিক্ষার সুফল নিয়ে সর্বত্র একটা আশঙ্কা বিরাজ করছে। অনেক বিজ্ঞজনই মনে করেন, সরকারের আন্তরিক উদ্যোগ ব্যর্থ হচ্ছে শিক্ষা গুণগত মানে উৎকর্ষ হারানোর কারণে।

গুণগত শিক্ষা কী

যে শিক্ষা মানুষের সুপ্তশক্তির উদ্বোধন ঘটায়, মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে সৃজনশীলতা, মানুষকে করে তোলে কর্মদক্ষ, সর্বোপরি মানুষকে মানবিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত করে সেই শিক্ষাই গুণগত শিক্ষা হিসেবে পরিগণিত। শিক্ষা অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটলেই সেই শিক্ষাকে গুণগত শিক্ষার অভিধা দেওয়া সম্ভব। শিক্ষার উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে সদর্থে বদলে দেওয়া, গুণগতভাবে মানুষকে উন্নত ও বিকশিত করা। যে শিক্ষা তার উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়, তাকে কোনোভাবেই গুণগত শিক্ষা বলা যায় না। পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হচ্ছে। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটা সার্টিফিকেট প্রদান ও গ্রহণের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে গেছে, শিক্ষা হয়ে গেছে বাণিজ্য-পণ্য।

শিক্ষার বর্তমান হাল

ডিগ্রি অর্জনের অন্ধ মোহে আবর্তিত হচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষা। অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো লক্ষ্য নেই– না মানসিক ও আত্মিক উন্নয়নের, না পেশা বাছাইয়ের। অবস্থা অনেকটা এমন যে, ভাসতে ভাসতে কোনোখানে গিয়ে ঠেকলেই হলো। ফলত শিক্ষা হয়ে গেছে সমাজে মূল্যবোধহীন বেকার জনগোষ্ঠী তৈরির একটি মেগা প্রকল্প। কর্মসংস্থানের সুবিধা এদেশে অনেক সংকুচিত; শিক্ষাজীবন শেষে বেকার হওয়ার উদ্বেগ নিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন কাটে। পড়াশোনার কঠিন সাধনার বদলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধাবিত হয় সহজ কোনো প্রতিষ্ঠার দিকে। অনেক শিক্ষার্থী জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সহজ পথ হিসেবে বেছে নেয় রাজনীতিকে। এ রাজনীতি নীতি-বিবর্জিত, একান্তই স্বার্থ-তাড়িত। এই রাজনীতিতে সন্ত্রাস আসে অনিবার্য নিয়মে। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষার যোগ থাকে না। পরীক্ষায় পাশ করার সহজ উপায় হিসেবে নকল বাড়ে; আর নকল হলো সংক্রামক ব্যাধির মতো। একজন নকল করলে পাশেরজন উৎসাহিত হয়। নকলের মতো ঘৃণ্য অপরাধ বহুল চর্চায় বৈধতা পায়। নকল বাড়লে মেধা কমে। এভাবে কলুষিত হয় শিক্ষা, কলুষিত হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করতে গিয়ে ব্যক্তিত্ব হারায় শিক্ষার্থীরা। সস্তা পথে কেউ কেউ প্রতিষ্ঠা

পেলেও অধিকাংশই হারিয়ে যায়। এভাবেই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর থেকে আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে এক গভীর সংকট, সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে অস্থিরতা।

অধিকাংশ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের কাছে শিক্ষা হলো চাকুরি নামক সোনার হরিণ শিকারের কলাকৌশল। যার ভাণ্ডারে যতবেশি তূণ থাকবে, শিকার করার প্রতিযোগিতায় সে ততবেশি এগিয়ে থাকবে। তাই আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের একটা অসম্ভব চাপ ও তাড়ার মধ্যে থাকতে হয়। স্কুলে সিলেবাস ভারি করা হয়েছে, বইয়ের সংখ্যা বেড়েছে, নতুন নতুন বিষয় যোগ হয়েছে, পরীক্ষার চাপ বেড়েছে। শিক্ষার ভয়াবহ মাত্রায় বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে। মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের খুবই অভাব, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকও নেই। যাঁরা আছেন, তাঁদের অনেক বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা নেই। এই চাপের সমাধান হিসেবে এসেছে কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিউশনি আর গাইড বই। অভিভাবকের বেড়েছে ব্যয়ের বোঝা। আর ঘন ঘন পরীক্ষার চাপ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ছোটাছুটি করতে হয় গাইড বই, স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিউটর, নোট ইত্যাদির মধ্যেই। সন্তানদের কাছে অভিভাবকদের দাবি বাইরের বই পড়বে না, ফার্স্ট হতে হবে, লেখাপড়া করে বড় লোক অর্থাৎ অনেক অর্থের মালিক হতে হবে, অনেক ক্ষমতাশালী হতে হবে। ফলত আমাদের শিক্ষার্থীরা চিন্তাশূন্য, বিশ্লেষণশূন্য, প্রশ্নশূন্য ও আত্মকেন্দ্রিক একেকটি রোবট-মানবে পরিণত হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসা রয়েছে, যেখানে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা নিষিদ্ধ অথবা উপেক্ষিত। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও শিক্ষার অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা প্রকট। পার্শ্ব প্রতিষ্ঠান বিবেচনায় মেধাবী শিক্ষার্থীরা পারতপক্ষে সেদিকে ভিড়ে না। বাংলাদেশে কিছু ব্যয়বহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যেখানে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয় খুবই নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ও তদারকির মধ্যে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাঠামোবদ্ধ পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্ত তারুণ্যের বিকাশ অসম্ভব।

শিক্ষার মানের অবনতির কারণ

শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও দেশে সমন্বিত পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। ব্যক্তি-স্বার্থে ও রাজনৈতিক বিবেচনায় অপরিকল্পিতভাবে প্রয়োজনহীন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেগুলো সুষ্ঠু শিক্ষা বিস্তারে শুধু অন্তরায়ই নয়, শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ ধ্বংসেরও কারণ। শিক্ষার উন্নয়নে মেধাবী শিক্ষকের কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষকতাকে মেধাবীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে রাষ্ট্র। শিক্ষকদেরকে এখানে করুণার দৃষ্টিতে দেখার মানসিকতা কাজ করে। মেধাবীরা তাই শিক্ষকতার প্রতি আগ্রহ থাকলেও অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার প্রত্যাশায় অন্য কোনো চাকরি খুঁজে নেয়। যারা আবেগের বশে শিক্ষকতায় আসে নানা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের শিকার হয়ে ক্রমান্বয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলত তাদের মেধার অনেক সময় অপচয়ই হয়। অথচ উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষকতাকেই সবচেয়ে মর্যাদার কাজ বলে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে কম মেধাবীরা নিতান্ত বাধ্য হয়েই জীবন-জীবিকার তাগিদে শিক্ষকতায় আসে, শিক্ষার প্রতি হয়তো তারা অন্তরের টান অনুভব করে না। শিক্ষাকে তারা পণ্য বানিয়ে নিজের ভাগ্যোন্নয়নে কাজে লাগায়; তাদের আকর্ষণ শ্রেণিকক্ষের চেয়ে নিজের প্রতিষ্ঠিত কোচিং সেন্টারেই বেশি কেন্দ্রীভূত থাকে। তদুপরি শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলোতে শ্রেণিকক্ষের সংকট চরমে। নেই কোনো উন্নত লাইব্রেরি, মান-সম্মত গবেষণাগার। আমাদের দেশে যুগোপযোগী উত্তম পাঠ্যপুস্তকের মারাত্মক অভাব রয়েছে। শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে গাইড বই আর শ্রেণিকক্ষের চেয়ে কোচিং সেন্টার বেশি আকর্ষণীয়। কারণ তারা চায় কম পড়ে ভাল ফলাফল করার সহজ দাওয়াই। নকলের প্রবণতাও একই কারণে মারাত্মক পর্যায়ে আছে। শিক্ষার্থীদের সামনে ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সুনির্দিষ্ট আশ্বাস নেই। হতাশার মধ্যে উদ্যমী হওয়ার মানসিক শক্তি অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই থাকে না। এসব কারণে আমাদের দেশের শিক্ষার মান কার্যত নিম্নমুখী।

গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের উপায়

শিক্ষা এমন একটি বহুমাত্রিক বিষয়, যার সঙ্গে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবই, শিক্ষার ব্যবস্থাপনা সরাসরি জড়িত। এর কোন একটিতে দুর্বলতা বা ত্রুটি থাকলে শিক্ষার মান ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের উন্নয়ন আর সমৃদ্ধিকে নিশ্চিত করতে চাইলে প্রথমেই এদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য দরকার–

১. শিক্ষায় শিক্ষার্থীদেরকে মনোযোগী করার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. পাঠ্যবইকে আকর্ষণীয় ও যুগোপযোগী করতে হবে।

৩. পর্যাপ্ত শিক্ষা-উপকরণ শিক্ষার্থীদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে।

৪. আধুনিক পাঠাগার, বিজ্ঞানাগার ও কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৫. গুণগত শিক্ষার জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষকতায় টেনে আনা সবচেয়ে বেশি জরুরি। এজন্য শিক্ষকতাকে সম্মানজনক ও আকর্ষণীয় করতে হবে। প্রাণ ছাড়া যেমন সুন্দর দেহ মূল্যহীন, তেমনি ভাল শিক্ষক ছাড়া গুণগত শিক্ষার স্বপ্ন বাস্তবায়ন অসম্ভব কল্পনা।
৬. শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করতে হবে। কোচিং সেন্টার, গাইড বইয়ের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৭. যুগোপযোগী, বাস্তবসম্মত ও জীবনঘনিষ্ঠ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।
৮. দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষকদের জন্য দেশে বিদেশে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৯. পরীক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। প্রশ্নপত্র প্রণয়নে শিক্ষকের দক্ষতার মূল্য প্রশ্নাতীত। সকল ক্ষেত্রে দক্ষ শিক্ষক দ্বারা মানসম্পন্ন প্রশ্ন-প্রণয়ন নিশ্চিত করতে হবে। পরীক্ষা থেকে নকল উচ্ছেদ করতে হবে।
১০. শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সচেতনতা সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়। কারণ উদ্দেশ্য পরিষ্কার না থাকলে অর্জনের পথটি ঝাপসা হতে বাধ্য।

উপসংহার

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত বিশ্বের সঙ্গে শামিল হওয়ার স্বপ্ন দেখে। এই মহৎ স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত, উন্নত মূল্যবোধলালিত সৃজনশীল জনশক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে। গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা গেলেই স্বপ্ন পূরণের পথে বহুদূর এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ, বাস্তবে রূপ পাবে স্বপ্নের 'সোনার বাংলা'।

পরিবারে নৈতিক শিক্ষা

মানুষ সামাজিক জীব, কিন্তু তার জীবনের শুরু হয় পরিবার থেকে। সামাজিক হওয়ার জন্য মানুষকে রপ্ত করতে হয় কিছু আচার-আচরণ, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ; আত্মকেন্দ্রিকতার বৃত্ত ভেঙে নিজেকে গড়তে হয় সমাজের উপযোগী করে; নিজেকে শাণিত করতে হয় সমষ্টিচেতনায়; নিজেকে নিবেদন করতে হয় পরার্থপরতায়। যে প্রক্রিয়ায় মানুষ আদিম প্রবৃত্তি ত্যাগ করে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে উন্নত মূল্যবোধসম্পন্ন সত্তায় পরিণত হয় তা-ই শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে করে কর্মদক্ষ, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে করে তীক্ষ্ণ, মানুষের বিবেককে করে পরিচ্ছন্ন, রুচি ও মূল্যবোধকে করে উন্নত। এক কথায়, শিক্ষাই মানুষের সার্বিক বিকাশের একমাত্র উপায়। আর নৈতিক শিক্ষা হলো সেই শিক্ষা যা মানুষের মধ্যে শুভ ও কল্যাণচিন্তার উন্মেষ ঘটায়, যার প্রভাবে ভাল-মন্দের তফাৎ নির্ণয় করে মানুষ ভালর পক্ষে অবস্থান নিতে পারে, মানুষ পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে। সমাজে একজন মানুষকে আমরা যে ভূমিকায় পাই তার বুনিয়াদ নির্মিত হয় পরিবারে। অর্থাৎ পরিবার ও শিক্ষা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং নীতি-আদর্শ শিক্ষায় পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম।
মানুষের একসঙ্গে থাকা ও সামবায়িকভাবে প্রতিকূলতা মোকাবেলার প্রয়োজন থেকে সমাজ গড়ে উঠেছে। আর সমাজ গড়ে তোলার পেছনে সক্রিয় রয়েছে মানুষের পারস্পরিক দায়বদ্ধতা– সহমর্মিতা, সহযোগিতা, স্বার্থত্যাগের মানসিকতা। সমাজ গঠিত হয় বিভিন্ন পরিবারের সমন্বয়ে। আর পরিবার হলো পিতা-মাতা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি ও অন্যান্য রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন, যারা এক সঙ্গে একই বাড়িতে থাকে, তাদের নিয়ে গঠিত সংসার। একটি শিশুর জন্মের পর থেকেই তার শিক্ষার শুরু হয়। জন্মগ্রহণের পর শিশুর সকল নির্ভরতা তার পরিবার, বিশেষত মা-বাবার ওপর। তার শেখার শুরুও মা-বাবার কাছ থেকেই। বাবা-মা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের নীতি-আদর্শেই বেড়ে ওঠে শিশু। ঘরেই শুরু হয় শিশুর প্রথম পাঠ আর মা-বাবাই শিশুর প্রথম শিক্ষক। একটি সুন্দর পারিবারিক পরিবেশই শিশুর পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ এবং সফলতার জন্য উপযুক্ত স্থান। পরিবারে নৈতিক ও মূল্যবোধ শিক্ষার ভিত দৃঢ় হয়; এ সময়ে শিশুকে যা দেখানো ও শেখানো হয় তা-ই তার চেতনাজগতের মৌল ভিত্তি নির্মাণ করে দেয়। পারিবারিক শিক্ষার আলোকে শিশু পরবর্তীতে সমাজ ও প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা নেয়। পরিবারের সদস্যদের যাপিত জীবন গভীর ছাপ ফেলে শিশুর চেতনায়। পরিবারের সদস্যরা সুশৃঙ্খল জীবনে অভ্যস্ত হলে শিশুও ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। অন্যদিকে পরিবারের সদস্যরা উচ্ছৃঙ্খল ও অনৈতিক জীবন যাপন করলে শিশু বিপথে পরিচালিত হবে– এটাই স্বাভাবিক। পারিবারিক প্রভাবে সে হবে একজন অনৈতিক, অসৎ ও নীতিবিবর্জিত মানুষ; যে দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য বিপজ্জনক।
কোন কিছু সৃষ্টির জন্য দৃঢ় ভিত্তির প্রয়োজন হয়; ভিত্তি যত মজবুত ও শক্ত হয় নির্মিত জিনিসের প্রতিকূলতা জয় ও টিকে থাকার ক্ষমতাও তত বেশি হয়। পরিবার একজন শিশুর গড়ে ওঠার প্রাথমিক ভিত নির্মাণ করে দেয়। জীবনের শুরুতেই

যদি একটি শিশু সদ্গুণাবলি অর্জন করতে পারে, তাহলে পরবর্তী জীবনে বাইরের কোন প্রভাব তার নীতি আদর্শকে টলাতে পারবে না। তাই শিশুর আদর্শ চরিত্র গঠনে পরিবারই যথার্থ ও আসল ভূমিকা পালন করতে পারে।

জন্মের পর একটি শিশু সাদা কাগজের অলিখিত পৃষ্ঠার মতো; অথবা এ সময়টিকে তুলনা করা যায় কাদা মাটির সঙ্গে। সাদা কাগজটিতে যা ইচ্ছা তা-ই লেখা সম্ভব, আর নরম মাটিকে ইচ্ছেমত আকৃতি দেওয়া খুবই সহজ। সাদা কাগজের পৃষ্ঠা কোন লেখায় পূর্ণ হবে তা যেমন নির্ভর করে লেখকের মেজাজ, রুচি আর দক্ষতার ওপর এবং নরম মাটি দিয়ে কী তৈরি হবে ও তা কতটা শৈল্পিক হবে তা যেমন নির্ভর করে কারিগরের শিল্প প্রতিভার ওপর, তেমনি একজন শিশু কোন রুচি, আদর্শ ও নীতির মানুষ হবে তা প্রকৃতই নির্ভর করে তার মা-বাবা ও পরিবারের সদস্যদের আচার-আচরণ, শিক্ষা, রুচি ও নৈতিক আদর্শের ওপর। পরিবারের মানুষদের প্রতিদিনের আচরণ, কথাবার্তা, চলাফেরা, কাজকর্ম, ব্যবহার ইত্যাদি শিশু অবচেতনে নিজের চেতনায় শুষে নিয়ে নিজের চেতনাজগৎ নির্মাণ করতে থাকে। পারিবারিক পরিবেশ যদি হয় শান্তিময়, ভালবাসাপূর্ণ, রুচিস্নিগ্ধ ও নৈতিক মূল্যবোধে শাণিত, তাহলে শিশুটি অবধারিতভাবেই হবে শান্তিপ্রিয়, ভালবাসায় পরিপূর্ণ হবে তার অন্তর, রুচির ছাপ থাকবে তার কথায় ও কর্মে, নৈতিক মূল্যবোধে তার জীবন হবে সমুন্নত। যে শিশু ভালবাসার মধ্যে বড় হয় সে কখনো সহিংস ও নিষ্ঠুর হতে পারে না; যে শিশু নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে বেড়ে ওঠে, তার মধ্যে হীনতা, নীচতা ও অনৈতিকতাকে প্রশ্রয় দেবে না; যে শিশু সদাচারের মধ্যে বড় হয় সে কখনো অন্যের সঙ্গে আচরণে রূঢ় হতে পারে না। অর্থাৎ শিশু পরিবার থেকে যা শেখে তা-ই তার চেতনার গভীরে স্থায়ী হয় এবং তার সারা জীবনের আচরণ ও কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেহেতু একটি শিশু তার পরিবারের সদস্যদের অনুসরণ করে তাই শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য পরিবারের সদস্যদের দায়-দায়িত্বও অনেক। যেমন সন্তানের সামনে ঝগড়াঝাটি না করা, খারাপ ভাষায় কথা না বলা, নেশা না করা, অনৈতিক কোন কাজ না করা, ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসন মেনে সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করা, আদর্শ ব্যক্তিদের জীবনী সম্পর্কে শিশুদের আগ্রহী করা– এসবের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে ইতিবাচক জীবনবোধের বার্তা ও আদর্শ পৌঁছে দিতে পারলে শিশু তার জীবনের পথটি সহজেই চিনে নিতে পারবে। একটি সুশিক্ষিত, ভাল, সৎ, রুচিশীল পরিবারের আগামি প্রজন্ম নীতি-আদর্শ শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হবে– এটাই স্বাভাবিক। আর একটি অসৎ পরিবারের সন্তান আদর্শবান ব্যক্তি হবে তা কল্পনা করাও অযৌক্তিক।

শিশু পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, জীবনের প্রাথমিক পর্ব শেষ করেই সে সমাজের বৃহত্তর অঙ্গনে প্রবেশ করে। পরিবারের হাত ধরেই শিশু বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করে, পরিবারের দায়িত্বও তাই কেবল পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, শিশুর সামাজিক জীবনেও পরিবারকে নজরদারি করতে হয়। গৃহে শিক্ষাদানের পাশাপাশি শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে হয়। সেখানে শিশুটি কী করছে, কী শিখছে, কার সঙ্গে মিশছে এসব বিষয়েও পরিবারের সদস্যদের খেয়াল রাখতে হবে। শিশু যাতে অসৎ সঙ্গে না মিশতে পারে, কোন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়াতে না পারে সে বিষয়ে গভীর নজরদারি রাখা পরিবারের অন্যতম দায়িত্ব। সন্তানকে ভালবাসার পাশাপাশি প্রয়োজনমত শাসন করতে হবে। এই শাসন হতে হবে ন্যায়সঙ্গত ও সীমাবদ্ধ; এই শাসনের মধ্যে যাতে হিংস্রতা না থাকে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। বর্তমান সময়ে মা-বাবা ও পরিবারের সদস্যদের ব্যস্ততা অনেক বেড়ে গেছে। অর্থ ও প্রতিপত্তির পিছনে ছুটতে গিয়ে তাঁরা পরিবার ও সন্তান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে অথবা যাচ্ছে। সন্তানকে সময় দেওয়ার সময় তাঁদের হাতে নেই। অর্থের বিনিময়ে তাঁরা সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব অন্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছে; নিঃসঙ্গ সন্তানের বিনোদনের জন্য হাতে তুলে দিয়েছে গেমস খেলার যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ইত্যাদি। শিক্ষা যখন পণ্য হয় তখন তাতে ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতা বাড়তে পারে, কিন্তু সেই শিক্ষার সঙ্গে নৈতিকতার দায় থাকে না। মা-বাবার বদলে সঙ্গ দেওয়ার কাজটি যখন করে যন্ত্র, তখন রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে তাদের মধ্যে স্নেহ-শ্রদ্ধা-ভালবাসায় মাখামাখি মানবিক কোন বন্ধন তৈরি হয় না; না পিতা-মাতার সঙ্গে, না আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে, না কোন মানুষের সঙ্গে। ক্রোধমিশ্রিত বিকৃত মানসিকতা নিয়ে বিচ্ছিন্নতা আক্রান্ত যন্ত্র হিসেবে সে গড়ে ওঠে। তখন সে অনায়াসে হত্যা করতে পারে জনক-জননীকে, হত্যা করতে পারে স্বজনকে, হত্যা করতে পারে যে কোন মানুষকে। তার সঙ্গলিপ্সু, ভালবাসা-বুভুক্ষু মন সঙ্গী খুঁজে বেড়ায় ইন্টারনেটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথবা অন্যত্র। কার সঙ্গে মিশছে, পরিণতি কী হতে পারে - এসব হিতাহিত ভাবার অবকাশ তার থাকে না। এভাবে কখনো তারা অমিতাচারে লিপ্ত হচ্ছে, কখনো নেশাগ্রস্ত হচ্ছে, কখনো বা বিভ্রান্ত আদর্শে সমর্পিত হচ্ছে। জড়িয়ে পড়ছে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদে। সাফল্য-সন্ধানী মানুষদের সকল অর্জন ব্যর্থ হয়ে যায় সন্তানের এই করুণ পরিণতিতে। চরম মূল্যে পরিশোধ করতে হয় সন্তানের প্রতি উদাসীনতার দায়। মনে রাখতে হবে, মা-বাবার সঙ্গ, ভালবাসা, স্নেহ সন্তানের কাছে পরম কামনার ধন; মা-বাবার ইতিবাচক

জীবনবোধ শিশুকে প্রত্যয়ী করে, মা-বাবার নীতি-আদর্শে সে গর্বিত হয়, উন্নত ও সম্মানিত জীবন গড়তে সে গভীর অনুপ্রেরণা অনুভব করে।
পরিবার সমাজেরই ক্ষুদ্র ইউনিট। তাই পারিবারিক দায়িত্ব পালন করলেই সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন শেষ হয়ে যায় না। প্রবাদ আছে, নগর পুড়লে দেবালয় এড়ায় না। সমাজে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিলে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির বিষ ঢুকলে তা এড়িয়ে যাওয়া বা তার সঙ্গে শরিক হওয়ার সুযোগ নেই। একদিকে সামাজিক অনাচার ও অমানবিকতাকে চুপচাপ দেখবো অথবা এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ব, অন্যদিকে সন্তানকে নীতি-আদর্শে বলীয়ান হতে বলবো -- তাতে কাজ হবে না। নিজে অন্যায় না করলে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করলে তা সন্তানের চেতনাজগৎকে প্রভাবিত করবে; পাশাপাশি নীতি-আদর্শের সঠিক পাঠ নিতে সে উদ্বুদ্ধ হবে। রাস্তার মোড়ে বা চায়ের স্টলে অথবা নির্জন স্থানে আগামি প্রজন্মের নষ্ট হয়ে যাওয়ার দৃশ্য আমরা প্রায়ই দেখি। নিশ্চয়ই তারা পরিবার থেকে ভাল শিক্ষা পায় নি। নষ্টরা তাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও নষ্ট করবে। তাই দেশ ও জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে পরিবারে নৈতিকতার চর্চা করা এবং সন্তানদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা আজ সময়ের দাবি।

পরিশেষে বলা যায়, পরিবারের দায়িত্বশীল ভূমিকাই পারে একজন সুশিক্ষিত, আদর্শবান, সৎ ও নীতিনিষ্ঠ মানুষ তৈরি করতে, যে কিনা পরিবার ও সমাজে আলো ছড়াবে এবং তার আলোয় জাগবে বিবেক, সাজবে স্বদেশ, উজ্জ্বল হবে জাতির মুখ।

সাহিত্যপাঠের আনন্দ

ভূমিকা

সাহিত্য জগৎ ও জীবনের দর্পণ। বৈচিত্র্যময় জগৎ-জীবনের নিগূঢ় বার্তা রসের আধারে ধারণ করে সাহিত্য। মানবমনের অতলান্ত ভাবনাকে, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রহস্যকে সাহিত্যিক তাঁর সূক্ষ্মানুভূতিময় অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে অমৃতের রসধারায় সিক্ত করে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। আমরা তাতে জগৎ-জীবনের খবর যেমন পাই, তেমনি আমাদের মনোবীণায় সঞ্চারিত হয় আনন্দের অপূর্ব সুরধারা। এককথায় জীবনকে পূর্ণতাদানের জন্য মানুষের কাছে সাহিত্যের আবেদন অনিঃশেষ।

সাহিত্যের স্বরূপ

'সাহিত্য' শব্দটির ব্যুৎপত্তি 'সহিত' শব্দ থেকে। এ শব্দটি পারস্পরিক সম্পর্কের একটি বাতাবরণ তৈরি করে। সাহিত্য এমন এক সেতুবন্ধ যা লেখকের সঙ্গে পাঠককে নিবিড় সম্পর্কে বাঁধে। কোন লেখনীর মাধ্যমে লেখকের ভাবনা, কল্পনা,অনুভূতি অকৃত্রিম সংবেদ্যতায় পাঠকের মনকে রসসিক্ত করে, তখনই সে লেখনীটি সাহিত্য পদবাচ্যের মর্যাদা লাভ করে। মানুষ সমাজ গড়েছে শুধু বস্তুগত প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে নয়; বরং সমাজগঠনে মানুষের সবচেয়ে বড় তাগিদটি ছিল নিজেকে অন্যের সঙ্গে মেলানো; নিজের চিন্তা-ভাবনা, কল্পনা, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার বিচিত্র অন্তর্ময় অনুভূতিগুলোকে অন্যের কাছে গভীরতর তাড়না। ব্যক্তি নিজেকে সমর্পণ করতে চায় সমষ্টির মধ্যে; নিজের ভাবকে সঞ্চারিত করতে চায় অন্যের ভাবের মধ্যে; নিজের প্রাণের মধ্যে অনুভব করতে চায় অন্যের প্রাণের সাড়া। পারস্পরিক সাহচর্য মানবসভ্যতাকে দান করেছে বিশিষ্টরূপ। আর মানুষে মানুষে সাহচর্যলাভের সবচেয়ে প্রভাবসঞ্চারী ও নান্দনিক মাধ্যম হচ্ছে সাহিত্য। সাহিত্যে মানুষের বিচিত্র ভাবের প্রকাশ ঘটে শুধু তা-ই নয়; রসমণ্ডিত হয়ে বাস্তবনিষ্ঠ ও জীবনঘনিষ্ট রূপ লাভ করে। জগৎ ও জীবনের বিচিত্র বিষয় সাহিত্যের উপজীব্য এবং তা মানুষের বিচিত্র রস পিপাসা মিটানোর জন্য বিচিত্র আঙ্গিকে রূপলাভ করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা।"

সাহিত্যপাঠের উদ্দেশ্য

সাহিত্যপাঠের প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দলাভ। লেখক নিজের চিত্তকে পরিতৃপ্ত করতে তাঁর রসভুবন তৈরি করেন; আর পাঠক সেই ভুবনে অবগাহন করেন আনন্দরসে সিক্ত হওয়ার অভিপ্রায়ে। মানবহৃদয়ের বিচিত্র অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করা যায় সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে। সাহিত্যপাঠে পাঠকের মনে যেমন নির্মল আনন্দানুভূতির সৃষ্টি হয়; তেমনি বিচিত্র জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে পাঠকের মননকে। সাহিত্য মানুষের জীবনচর্যার সমগ্রতাস্পর্শী মাধ্যম। ত্যাগে, ভোগে, আত্মদানে, মহত্ত্বে, বীরত্বে অথবা এসবের বৈপরীত্যে মানুষ যে জীবন যাপন করে; যে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশে জীবন যাপন করে তার চড়াই-উৎরাই ও বিবর্তনের ইতিবৃত্ত; ভ্রমণবৃত্তান্ত, দুঃসাহসিক অভিযান, বিজ্ঞানের আবিষ্কার, দেশ-দেশান্তরের

ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়, সামাজিক আচার-আচরণ অর্থাৎ মানবজীবন ও বৈচিত্র্যময় জগতের সকল প্রান্তের সংবাদ নিয়েই শিল্প-সাহিত্যের বহুমুখী স্রোতোধারা। সাহিত্যপাঠে মানুষের মনের দিগন্ত উন্মোচিত ও প্রসারিত হয়; উঁকি দেয় মুক্তচিন্তা; মন হয় পরিশুদ্ধ ও নির্মল।

সাহিত্যপাঠের প্রয়োজনীয়তা

সাহিত্যের সাধনা সত্য ও সুন্দরের সাধনা। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা জগৎ ও জীবনের চিরায়ত সত্য ও সুন্দরকে অনুধাবন করি। ঋদ্ধ মননশীলতা, অপার সৃজনশীলতা আর সূক্ষ্ম অনুভবময়তার কারণেই শিল্পী-সাহিত্যিকেরা মানবসমাজের সবচেয়ে অগ্রসর অংশ। অনুভূতির সূক্ষ্ম শিকড় চাড়িয়ে শিল্পী-সাহিত্যিকেরা জগতের অপার রহস্যজাল থেকে সত্য ও সুন্দরকে ছেনে বের করে তার অমৃতরস আমাদের সামনে তুলে ধরেন। পাঠক সেই রসসুধা পান করে এক অনাবিল আনন্দে পরিপ্লাবিত হয়; পাশাপাশি যে সত্য-সুন্দরের বার্তা পায় সাহিত্যে, তারই আলোকে সাজায় আপন জীবন-ভুবন।
সাহিত্যপাঠে মানুষ অর্জন করে পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি, যা সকল ক্ষুদ্রতার বন্ধন মুক্ত করে তাঁকে উপনীত করে মহত্ত্বের উপলব্ধিতে। সাহিত্য মানুষের মনে নান্দনিকতার বোধ জাগায়, জগৎ ও জীবনকে দেখার শৈল্পিক দৃষ্টি দান করে। সাহিত্য মানুষকে উন্নত রুচিবোধ ও চিন্তা-চেতনার সন্ধান দেয়। সাহিত্য শুভবোধে উদ্দীপ্ত কল্যাণময় ও সৌন্দর্যময় জীবন বিনির্মাণের রসদ জোগায়। ফলত সাহিত্যপ্রেমী মানুষের প্রতিটি কর্মে ও আচরণে শিল্পের ছোঁয়া থাকে।
মানবতার বাণী সাহিত্যে মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হয়; শোষণ, বঞ্চনা, উৎপীড়ন, নিষ্ঠুরতা আর সহিংসতার বিরুদ্ধে সাহিত্যের উচ্চারণ অত্যন্ত বলিষ্ঠ। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে সাহিত্য বিশ্বময় মানুষকে সম্প্রীতির বন্ধনে বাঁধে। সাহিত্য জাতীয় জাগরণ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধিকারের দাবি উচ্চারণের মাধ্যমে পরাধীন, অধিকার-বঞ্চিত মানুষের মনে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটায়।

সাহিত্যে সমাজ, সংস্কৃতি তার ইতিহাস-ঐতিহ্যসমেত সমগ্র চেহারা নিয়ে প্রতিফলিত হয়। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবনের আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংকট-সম্ভাবনার চিত্র বাঙ্ময় হয়ে ওঠে সাহিত্যে। তাই সাহিত্যপাঠে সমাজকে জানা যায় অনুপুঙ্খরূপে।

সত্য-সুন্দরের সাধনায় জীবনকে মহিমান্বিত করার ক্ষেত্রে সাহিত্যের ভূমিকা অনন্য। এটি সাহিত্যের উপযোগের দিক; কিন্তু গৌণ দিক মাত্র। দৈনন্দিন জীবনে কর্মে ক্লান্ত, হতাশায় নিমজ্জিত, সমস্যায় ক্লিষ্ট মানবমন চায় একটু স্বস্তির অবসর; প্রত্যাশা করে ক্লান্তিদায়ী ভুবনের প্রতিস্পর্ধী অন্য ভুবন, যে ভুবন স্বপ্নের, আনন্দের, রোমাঞ্চের। আমরা যখন শোকে বিহ্বল, আনন্দে আত্মহারা আর হতাশায় বিধ্বস্ত হই তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন আমাদের এ অনুভূতি জগৎকে সাহায্য করতে পারে না। ক্লান্ত-বিধ্বস্ত-অবসাদগ্রস্ত মনে আনে অনাবিল শান্তি। সাহিত্য প্রাণের ভাষায় প্রাণের কথা বলে। তাই সাহিত্য প্রাণে প্রাণে প্রেরণা ছোটায়, স্পন্দন জাগায়। কবি ওমর খৈয়াম তাই বেহেশতের আসবাবপত্রের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কাব্যগ্রন্থের কথা ভুলেননি : রুটি,মদ হয়তো নিঃশেষ হয়ে যাবে, সাকি ক্লান্ত হয়ে পড়বে, কিন্তু অমর কাব্য তার সাথে থাকবে অনন্ত যৌবনা সঙ্গিনীর মতো।

উপসংহার

মানুষের হৃদয়ানন্দে সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্য; সাহিত্যে বিম্বিত হয়েছে মানুষের আপন অন্তরতম সত্তার পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "গোলাপের সৌন্দর্য আমি যে উপভোগ করছি তা এমন করে প্রকাশ করতে হয়, যাতে তোমার মনেও সৌন্দর্যভাবের উদ্রেক হয়।" সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যকর্মে যে আনন্দরসের সঞ্চার করেন, তা উপলব্ধির জন্য পাঠককেও প্রস্তুত হতে হয়। সাহিত্যের জগৎ থেকে আনন্দ লাভের জন্য মানুষকে অধ্যবসায়ী হতে হয়। তবেই সাহিত্যপাঠের আনন্দ দীর্ঘদিন মানুষের মনকে সুরভিত রাখে।

রচনার নমুনা

সংকেতের সাহায্য নিয়ে নিচের রচনাগুলো লিখুন। প্রয়োজনে অন্যান্য বইপত্রের সাহায্য নিন। শিক্ষক ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে রচনা লেখার ব্যাপারে আলোচনা করুন।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

১. সূচনা
২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ কী
৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকারভেদ
৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য
৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনের কারণ
৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনজীবন বিধ্বস্ত হওয়ার কারণ
৭. বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান ও দুর্যোগ
৮. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ
৯. প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিণাম
১০. দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় ও প্রতিকার
১১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন সংস্থা
১২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা
১৩. উপসংহার

গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া ও বাংলাদেশ

১. সূচনা
২. গ্রিন হাউস কী
৩. গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া কী
৪. গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার কারণ
৫. গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার ফলাফল
৬. গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার বাংলাদেশে প্রভাব
৭. গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার বৈশ্বিক প্রভাব
৮. গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধের উপায়
৯. গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধে বৈশ্বিক পদক্ষেপ
১০. গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধে বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপ
১১. উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাংলাদেশ

১. সূচনা
২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি
৩. মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য
৪. মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বরূপ
৫. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেম
৬. জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন
৭. মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনুপস্থিতি ও এর প্রভাব
৮. বাংলাদেশের রাজনীতিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অপপ্রয়োগ

৯. বর্তমান বাস্তবতায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা
১০. উপসংহার

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প
১. সূচনা
২. পর্যটনের পরিচয়
৩. পর্যটনের আদিকথা
৪. অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব
৫. বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের বিকাশ ও সম্ভাবনা
৬. বাংলাদেশের পর্যটনকেন্দ্রের বিন্যাস
৭. বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে সরকারের পদক্ষেপ
৮. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও অন্যান্য সংস্থা
৯. বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের বিকাশে করণীয়
১০. উপসংহার

টেলিভিশন
১. ভূমিকা
২. টেলিভিশন কী
৩. আবিষ্কার
৪. টেলিভিশনের উপযোগিতা বা গুরুত্ব
৫. বাংলাদেশ ও টেলিভিশন
৬. দৈনন্দিন জীবনে টেলিভিশন
৭. টেলিভিশনে জাতীয় জীবনের প্রতিফলন
৮. প্রচার মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন
৯. শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন
১০. সংস্কৃতির বিকাশে টেলিভিশন
১১. জনমত গঠন ও গণতন্ত্রের বিকাশে টেলিভিশন
১২. অর্থনৈতিক উন্নয়নে টেলিভিশন
১৩. বিনোদনে টেলিভিশন
১৪. অপকারিতা
১৫. উপসংহার

শিষ্টাচার
১. সূচনা
২. শিষ্টাচার কী
৩. জীবনে শিষ্টাচারের গুরুত্ব
৪. জীবনে শিষ্টাচারের পরিচয়
৫. শিষ্টাচার অর্জনের উপায়
৬. শিষ্টাচারের সুফল
৭. উপসংহার

বাংলাদেশের যানজট সমস্যা

১. ভূমিকা
২. যানজট কী
৩. বাংলাদেশে যানজটের স্বরূপ
৪. যানজট সৃষ্টির কারণ
৫. যানজটের ভয়াবহ কুফল
৬. যানজট নিরসনের উপায়
৭. যানজট নিরসনে সরকার গৃহীত পদক্ষেপ
৮. যানজট নিরসনে নাগরিকের করণীয়
৯. উপসংহার

একটি চন্দ্রালোকিত রাত্রি
১. ভূমিকা
২. চন্দ্রালোকিত রাতের তিথি বা তারিখ
৩. চন্দ্রালোকিত রাতের আবির্ভাব
৪. চন্দ্রালোকে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ
৫. চন্দ্রালোকিত রাতের সৌন্দর্য ও মুগ্ধতার আবেশ
৬. মানব-মনে জ্যোৎস্নার প্রভাব
৭. রাতের বিভিন্ন পর্বের জ্যোৎস্নার রূপ ও মনোরম দৃশ্য
৮. রাত শেষ হওয়ার আগের দৃশ্য
৯. মনের ভাবনার সঙ্গে প্রকৃতির যোগসাধন
১০. উপসংহার

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ
১. ভূমিকা
২. প্রাকৃতিক সম্পদ কী
৩. প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকারভেদ
৪. ভূমি-সম্পদ
৫. বনজ সম্পদ
৬. মৎস্য সম্পদ
৭. নদ-নদী
৮. খনিজ সম্পদ – গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, খনিজ তেল, সিলিকা
৯. সৌরশক্তি
১০. প্রাকৃতিক সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব
১১. প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার
১২. উপসংহার

বাংলাদেশের উৎসব
১. ভূমিকা
২. উৎসব কী
৩. উসবের ধরণ ও প্রকৃতি
৪. বাংলাদেশে উৎসবের সমারোহ
৫. ঋতু উৎসব
৬. ধর্মীয় উৎসব

৭. সামাজিক উৎসব
৮. সাংস্কৃতিক উৎসব
৯. ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উৎসব
১০. জাতীয় উৎসব
১১. অর্থনীতি-সংশ্লিষ্ট উৎসব
১২. স্মরণোৎসব
১৩. উৎসবের সর্বজনীন রূপ
১৪. ব্যক্তিগত জীবনে উৎসবের প্রভাব
১৫. জাতীয় জীবনে উৎসবের প্রভাব
১৬. উপসংহার

ইন্টারনেট

১. সূচনা
২. ইন্টারনেট কী
৩. ইন্টারনেটের স্বরূপ
৪. ইন্টারনেটের উদ্ভব ও বিকাশ
৫. ইন্টারনেট সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া
৬. ইন্টারনেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান
৭. বাংলাদেশে ইন্টারনেটের ব্যবহার
৮. ইন্টারনেট ব্যবহারের উপকারিতা
৯. ইন্টারনেট ব্যবহারের অপকারিতা
১০. উপসংহার

কম্পিউটার ও আধুনিক সভ্যতা

১. ভূমিকা
২. কম্পিউটার কী
৩. কম্পিউটার আবিষ্কারের কথা
৪. কম্পিউটারের কাঠামো
৫. কম্পিউটারের বহুমাত্রিক ব্যবহার
৬. বাংলাদেশে কম্পিউটারের ব্যবহার
৭. বাংলাদেশের উন্নয়নে কম্পিউটারের অবদান
৮. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কম্পিউটার ব্যবহারের অপরিহার্যতা
৯. উপসংহার

খেলাধুলায় বাংলাদেশ

১. সূচনা
২. খেলাধুলা কী
৩. খেলাধুলার গুরুত্ব
৪. বাংলাদেশের নিজস্ব খেলা
৫. বাংলাদেশের বিদেশি খেলা
৬. খেলাধুলায় বাংলাদেশের অবদান
৭. উপসংহার